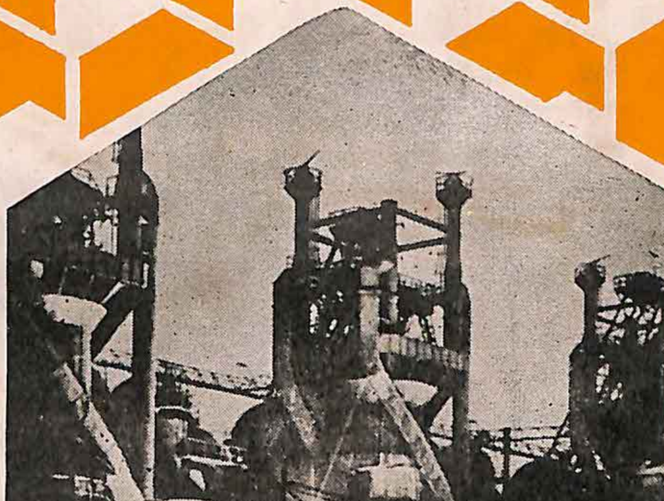
খনিজ লোহা থেকে ইস্পাত

পরিমল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়



পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

বিজ্ঞান পুস্তিকা

KHANIJ LOHA THEKE ISPAT
[*FROM ORE TO STEEL*]
Parimal Chandra Mukhopadhyay

প্রকাশকাল ঃ
প্রথম মুদ্রণ ঃ সেপ্টেম্বর ১৯৯০/বি

প্রকাশক ঃ
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
আর্য ম্যানসন (নবম তল)
৬এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
কলিকাতা ৭০০ ০১৩

মুদ্রক ঃ
শ্রী প্রবীরকুমার পান
শ্রী লক্ষ্মী সরস্বতী প্রেস
২০৯বি, বিধান সরণী
কলিকাতা ৭০০ ০০৬

মূল্য ঃ দশ টাকা

Published by Shri Shibnath Chattopadhyay, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board, under the centrally sponsored scheme of production of books and literature in regional languages at the University level launched by the Government of India in the Ministry of Human Resource Development (Department of Education), New Delhi.

উৎসর্গ

পিতৃ-মাতৃ চরণে

প্রস্তাবনা

মানুষ যখন লোহা আবিষ্কার ক'রে তার ব্যবহার শিখল, সে সময়টা নিশ্চয় ছিল মাহেন্দ্রক্ষণ। তাইতো সেই গাঁটছড়া আজ সাত পাকে বাঁধা। অথচ এই ক্রম বিবর্তনের ধারার কতটুকুইবা আমরা জানি। সে সম্পর্কে আমাদের মত মানুষকে সচেতন করতেই এই উপাখ্যান। রচয়িতা আমি হলেও প্রকৃত শিল্পী আমাদের একমাত্র সন্তান শ্রীমান অমিত। সে ধাতুবিদ ইঞ্জিনিয়ার। গত ১৯৭৪ এর মাঝামাঝি থেকে সে রাউরকেল্লা ইস্পাত কারখানায় দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত আছে। তার পরেই উল্লেখ করতে হয় আমার ধর্মপত্নী পাপড়ি এবং পুত্রবধূ অর্পিতার নাম। এরা দুজনে আমাদের দুই দুরন্ত নাতি পীকলু ও বান্টুকে সামাল দিয়ে আমার কলম সচল রাখতে সচেষ্ট থেকেছে। যে সমস্ত লিপিবদ্ধ সঙ্কলন পড়েছি তার মধ্যে আছে ঃ From Ore To Steel by Mmf Toujssaint, Dipl. Ing, Vdi, Vdeh ; এবং Manufacture of Iron & Steel (Vol.-1) by G Reginald Bashforth. সামগ্রিক শিল্প জগতে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি যে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে, লোহা এবং ইস্পাত শিল্প তা থেকে মুক্ত নয়। ভারী শিল্পের মধ্যে লোহা এবং ইস্পাত অন্যতম প্রধান। সুতরাং, চাইলেই সব পরিবর্তন, পরিবর্ধন দুম করে চালু করা যায় না। কারণ, এর সাথে জড়িয়ে থাকে কোটি কোটি টাকা, সময়, পরিস্থিতি, এবং কারিগরি অগ্রগতির প্রশ্ন। তবে কোথাও কোন নতুন প্রকল্প চালু করার প্রয়োজন দেখা দিলে, সাধ্যমত আধুনিকই প্রাধান্য পায়। ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এমনকি একই দেশে বিভিন্ন প্রথা পদ্ধতির প্রচলন লক্ষণীয়। সুতরাং এই আখ্যায়িকা মূলত মৌল ধারায় প্রবাহিত। চলাই প্রগতি, তার শেষ কোথায়!

কলকাতা, আশ্বিন, ১৩৯৭

পরিমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বিষয় সরণী

অবতরণিকা

প্তুলের মা তার মনিব গিন্নীকে ঠাকুরের জন্য কেনা ষ্টেনলেস ষ্টিলের থালা ঘটি দেখে আঁতকে উঠে বলেছিল—সে কি গো মা! ঠাকুরের জন্য ইস্টিলের বাসন! এতো নোয়া, অশুদ্দ। জবাবে গিন্নীমা বলেছিলেন—কেন বাছা, আজকাল তো সবাই ব্যবহার করছে। কথা না বাড়িয়ে পুতুলের মা বলেছিল—কি জানি গো মা, কালে কালে কতই দেখব। যত সব অনাছিষ্টি।

পুতুলের মা ঠাকুরের বাসন অশুদ্ধ বললেও, তার হাতের নোয়া অক্ষয় রাখতে ঠাকুরের কাছে কম মাথা ঠোকে না।

আসলে ঐ যে বলল কালে কালে; সেই কালের প্রবাহে এই লোহা তথা ইস্পাত এখন আমাদের নিত্যসঙ্গী। শুধুই কি বাসন-কোসন আর আসবাব পাত্র। ঘরবাড়ি বানাতে একে চাই-ই-চাই। বাড়ির বাইরে, সাইকেল, স্কুটার, মোটর, ট্রাম, বাস, রেলগাড়ি, জাহাজ, বিমান, যন্ত্রপাতি—যা বাদ দিলে আমাদের জীবনযাত্রা অচল। সত্যিকারের প্রয়োজনের তালিকা বুঝি মহাভারতের শ্লোক সংখ্যাকেও ছাড়াবে!

বর্তমানে, লোহা তথা ইস্পাত আমাদের জীবনযাত্রার মানদণ্ড ঃ কোন্ দেশ মাথাপিছু কত ইস্পাত খরচ করে তাই দিয়ে নির্দিষ্ট হয় জীবনযাত্রা মানের তারতম্য। অন্যভাবে বলা যায় লোহা ও ইস্পাত শিল্পের ভিত যে দেশে যত বেশি পোক্ত, সে দেশ শিল্প এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে তত বেশি পারদর্শী এবং সুসংহত। এ কারণেই প্রত্যেক দেশের একান্ত প্রচেষ্টা থাকে প্রাণবন্ত লোহা ও ইস্পাত শিল্প প্রতিষ্ঠা করার দিকে।

যদিও এই প্রচেষ্টার শুরু যান্ত্রিক সভ্যতার আদিযুগ থেকেই, কিন্তু প্রকৃত সচেতনতা গড়ে উঠে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরেই। ফলে, 1920 থেকে 1929 এই দশ বছরে সারা পৃথিবীর বার্ষিক ইস্পাত পিণ্ড উৎপাদন 72 মিলিয়ন টন থেকে বেড়ে হয় 120·5 মিলিয়ন টন। তবে 1929 সনে যে বিশ্বব্যাপী মন্দা দেখা দেয় তাতে 1930 থেকে 1932, এই তিন বছরে উৎপাদন প্রায় 50 মিলিয়ন টন কমে যায়। অবশ্য তার পর থেকে উৎপাদন বৃদ্ধির হার অব্যাহত গতিতে এগিয়ে গিয়ে 1938-এ 110 মিলিয়ন টনে দাঁড়ায়। এর মধ্যে আমেরিকার অবদান 29 মি. টন (26·5%), অবিভক্ত জার্মানী 23 মি. টন (21%), রাশিয়া 18 মি. টন (16·2%), গ্রেট ব্রিটেন 10·5 মি. টন (9·5%) এবং ফ্রান্স 6·2 মি. টন (5·6%)। বাকি 21

শতাংশের মত উৎপাদন করে অপর কুড়িটি দেশ। বলাই বাহুল্য, ভারতের স্থান নগণ্য। এমন কি 1960 সনে যখন সারা দুনিয়ার উৎপাদন বেড়ে 344·90 মি. টনে দাঁড়ায়, তখনও আমাদের অবদান মাত্র 3·12 মি. টন (0·9%)। পরের কুড়ি বছরে, অর্থাৎ 1980 পর্যন্ত সারা দুনিয়ার উৎপাদন বেড়ে হয় 621·2 মি. টন। ভারতও উন্নতি করে। উৎপাদন 3·12 মি. টন থেকে 7·4 মি. টনে পৌঁছে দেয়।

এই শিল্পের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে কয়লা। প্রধান জ্বালানি তো বটেই এমন অনেক উপজাত আমরা এর কাছ থেকে পাই যার সাহায্যে আমরা সার্বিকভাবে শিল্প এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে পারি।

লোহা কী-ইস্পাতই-বা-কী

লোহা মৌল ধাতু। রাসায়নিক চিহ্ন Fe। মাতা বসুন্ধরার ত্বকের প্রায় 4·6 শতাংশই লোহা। তবে ছিটে ফোঁটা উল্কা পিণ্ড ছাড়া লোহা নিখাদ অবস্থায় পাওয়া যায় না। আকরিক অবস্থায় এর সাথে মিশ্র অবস্থায় থাকে কিছু ধাতব এবং অধাতব পদার্থ। ধাতবের মধ্যে আছে ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমিয়াম এবং টাংস্টেন। আর অধাতবের মধ্যে আছে অক্সিজেন, কার্বন, সিলিকন, ফসফরাস এবং সালফার। তবে স্থান এবং মান ভেদে এই সংযুতির হারেও তারতম্য থাকে। প্রয়োগ ক্ষেত্রে এদের কেউ কেউ অচ্ছ্যুত, আবার কেউ বা অতি সমাদৃত ভি. আই. পি। কার্বনের ভূমিকা খানিকটা নায়কের মত। এর উপস্থিতি এবং শতাংশের উপর নির্ভর করে: সহজে দ্রবণযোগ্য কিনা, ভঙ্গুর হবে নাকি, কতটা খরতা (hardness) প্রবণ, এবং আকার রূপান্তর করা কতটা সম্ভব।

মারুত চুল্লী (Blast Furnace) জাত যে পিণ্ড লোহায় 2 থেকে 7·5 শতাংশ কার্বন থাকে তা সহজেই গলান যায়, এবং ছাঁচে ঢালাইয়ের পক্ষে খুবই উপযোগী। কিন্তু, চাপ দিয়ে বা হাতুড়ির ঘা মেরে কিছু করতে গেলেই তা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। মানে, ঘা মেরে একে দিয়ে যা খুশি তাই করিয়ে নেবেন তা চলবে না। যাকে বলে ভাঙ্গবে তবু মচকাবে না।

ফসফরাস এবং সালফারের পরিমাণও রাশ ধরে কমাতে হয়। ফসফরাস লোহার দ্রবণ প্রবণতা যেমন বাড়ায়, তেমন এর ভঙ্গুর প্রবণতাও।

সালফারের পরিমাণ সামান্য বেশি হলেই লোহা গনগনে লাল অবস্থায় ভঙ্গুর হয়। শিল্প জগতে একে বলে রেড সর্ট (red short)। সুতরাং এ জাতীয়

লোহার প্রয়োগ ক্ষেত্র খুবই সীমিত। তাই, ব্যাপক প্রয়োগের জন্য এমন পিণ্ড লোহা উৎপাদন করা দরকার যাকে খুশিমত চাপ দিয়ে বা পিটিয়ে মনের মত জিনিষটি তৈরি করা যায়। সুতরাং, এর সংযুতি (composition) নিয়ন্ত্রণ অত্যাবশ্যক। এ জাতীয় নমনীয় (malleable) লোহায় কার্বনের শতাংশ 0·01 থেকে 2·0-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

ইস্পাত বলতে এক সময় খুব উচ্চটান (tensile) ক্ষমতাসম্পন্ন লোহাকেই বোঝাত। কিন্তু, বর্তমানে সব রকম নমনীয় লোহাই ইস্পাত নামে পরিচিত। ব্যতিক্রম বিশেষ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন নমনীয় লোহা। সুতরাং, লোহা বলতে পিণ্ডই হোক বা ঢালাই হোক তাকেই বোঝায় যার কার্বনের পরিমাণ দুই শতাংশের বেশি। দুই শতাংশের কম কার্বন যুক্ত লোহাই আজ ইস্পাত নামে প্রচলিত। বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় এবং সংযুতিতে ইস্পাত উৎপন্ন হয়। এর সবই কি সব কাজের উপযোগী? জবাব খুঁজতে গিয়ে পাল্টা প্রশ্ন: সব মানুষই কি সব কাজের উপযুক্ত? তা হয় না। সব ফুলও সব দেবতার পূজায় লাগে না। ইস্পাতও তার ব্যতিক্রম নয়। সুতরাং, ক্রেতার স্বার্থে অবশ্যই ইস্পাতের দেহে জাতপাতের ছাপ লাগান একান্ত প্রয়োজনীয়।

এই পরিচিতির ছাপ দিতে গিয়ে যা যা বিবেচনা করতে হয় তার মধ্যে প্রধান হল:

কোন পদ্ধতিতে ইস্পাত তৈরি,
কোন কাজের জন্য তৈরি,
দেখতে কেমন, এবং
বিশেষ পদ বাচ্য।

পদ্ধতিগতের মধ্যে আছে:

বেসিক বেসিমার ইস্পাত,
এসিড বেসিমার ইস্পাত,
অক্সিজেন ইস্পাত,
খোলা মেঝে (open hearth) ইস্পাত, এবং
তাড়িত ইস্পাত।

ব্যবহার ভিত্তিক নামকরণে প্রথমেই বলতে হয় ঢালাই ইস্পাতের কথা। যে ইস্পাত ছাঁচে ঢেলে শক্ত পিণ্ডে পরিণত করা হয় তার প্রসার্ধতা (ductility) এবং প্রসার্ধমান অবস্থার কোন পর্যায়ে পিণ্ড ছিন্ন হবে (tensile strength) তা ঢালাই

লোহার চাইতে অনেক অনেক বেশি। ভারী কাজে ব্যবহৃত কলকব্জা এ জাতীয় ইস্পাতে তৈরি হয়।

শতকরা 12 ভাগ ম্যাঙ্গানিজ মিশিয়ে যে বিশেষ ধরনের ঢালাই ইস্পাত উৎপন্ন হয়—পরিচিতি হ্যাডফিল্ড ম্যাঙ্গানিজ ইস্পাত—তার ক্ষয় প্রতিরোধ ক্ষমতা অতি উচ্চ মানের। ফলে, ড্রেজার বাকেটের মত অতিকায় যন্ত্রের দাঁত এই ম্যাঙ্গানিজ ইস্পাতে তৈরি হয়।

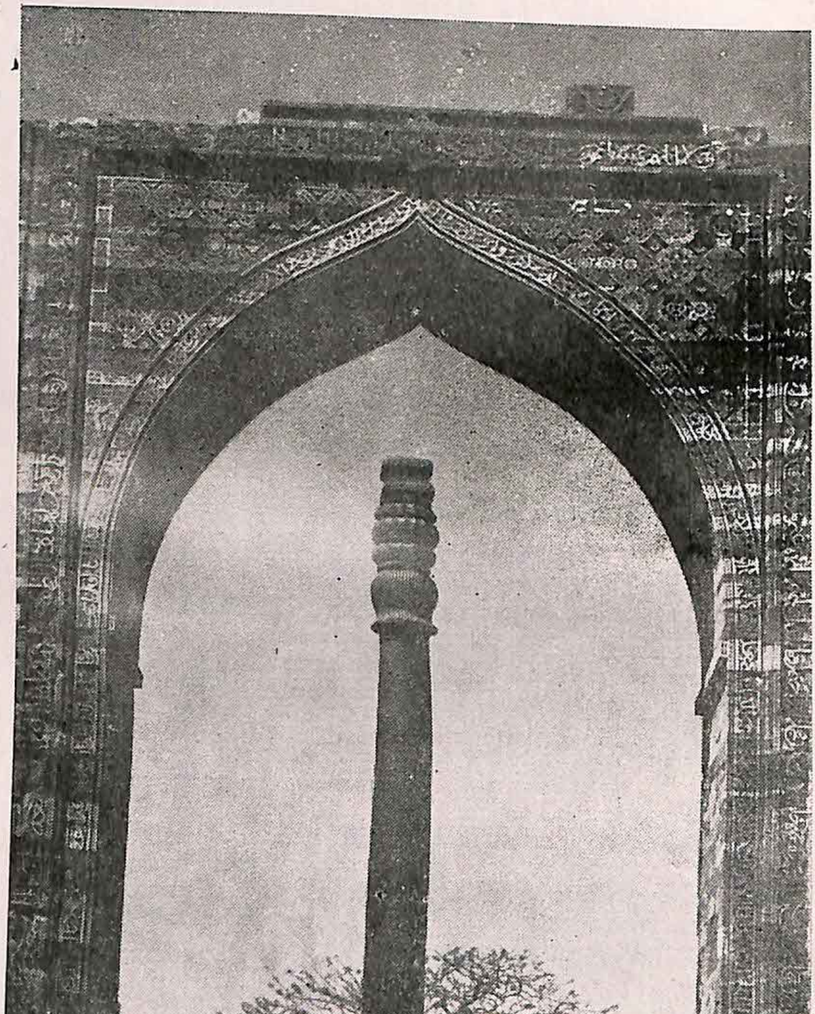
এককালে 'লোহার' তার হাপরে ইস্পাত পিণ্ডকে গনগনে লাল করে হাতুড়ি পিটাই করে নানা আকারের ভোগ্যপণ্য বানাত। বর্তমানে এ দৃশ্য সম্পূর্ণ লুপ্ত না হলেও উৎপন্ন ইস্পাতের সিংহভাগ চলে যায় আবর্তন কর্মশালায় (rolling mills)। পাত, বিম, রেল, রড ও নল প্রভৃতি নানা আকারে রূপান্তরিত হতে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নামাঙ্কিত হয় চেহারা অনুযায়ী।

এ ছাড়াও আছে বিশেষভাবে উৎপন্ন মিশ্র ইস্পাত, যেমন ঃ

উচ্চ তাপমান ইস্পাত (high temperature steel)। এ ধরনের ইস্পাত থেকেই তৈরি হয় বয়লার জাতীয় কল যা 500° থেকে 600° সেলসিয়াস তাপমানের মধ্যে অবিরাম কাজ করে চলেছে।

এই ইস্পাত প্রধানতঃ মলিবডিনাম মিশ্রণে উৎপন্ন।

তাপরোধী ইস্পাত (heat resistant steel) উৎপন্ন হয় ক্রোমিয়াম, নিকেল, এ্যালুমিনিয়াম, এবং সিলিকন মিশ্রণে। শিল্প জগতে ব্যবহৃত নানা জাতের চুল্লী, ওভেন, এবং পারিবারিক ক্ষেত্রে নানা সরঞ্জাম, যেমন ঃ তাড়িতইস্ত্রী, রান্নার ষ্টোভ তৈরী হয় এই ইস্পাতে। এদের তাপরোধী ক্ষমতা 1300° সেলসিয়াস বা তার বেশি হওয়া চাই—আমাদের অতি পরিচিত ষ্টেনলেস স্টিল, এবং এ্যাসিড প্রতিক্রিয়ারোধী ইস্পাত তৈরি হয় 12 শতাংশ বা তার বেশি ক্রোমিয়াম মিশ্রণে যা ইস্পাতকে সম্পূর্ণরূপে মরচে প্রতিরোধী করে তোলে। জাহাজের মাস্তুল, সেতু প্রভৃতি বস্তু যা আকাশের তলায় খোলা অবস্থায় থাকে তা তৈরি হয় এ ধরনের ইস্পাত থেকে। উপরন্তু, যদি এর সাথে সামান্য নিকেল মিশিয়ে দেয়া যায় তবে উৎপন্ন ইস্পাত হয় আরও বেশি আঁটোসাটো এবং রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ারোধী। এই ইস্পাত সে সমস্ত শিল্পে খুবই জনপ্রিয় যেখানে গৃহস্থালি এবং চিকিৎসা উপকরণ তৈরি হয়। রসায়ন উৎপাদনকারী শিল্পেও এর সমান সমাদর। উৎপন্ন



অতীতে লৌহ এবং ইস্পাত শিল্পে ভারতের উৎকর্ষতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই মেহারৌলী স্তম্ভ
(পঞ্চম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত, পুরানা দিল্লী কুতুব মিনারের কাছে)
চিক্কন দেহে আজও চির নতুন।

পণ্যের তালিকা দীর্ঘ। তার মধ্যে উল্লেখ্য ঃ রান্নার বাসন-কোসন, ছুরি, কাঁটা, চামচ, এবং অস্ত্রোপচার যন্ত্রপাতি।

সাধনী ইস্পাত (tool steel) উৎপন্ন হয় সাধারণ ইস্পাতে সামান্য কার্বনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। এই ইস্পাত থেকেই তৈরি হয় ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে ব্যবহৃত সাধারণ মানের সাধনী যন্ত্র (tools)। তবে আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে এমন অনেক সাধনী যন্ত্র লাগে যার জন্য দরকার অতি উচ্চ শক্তিধর সাধনী ইস্পাত।

এই ইস্পাত উৎপন্ন হয় বিভিন্ন অনুপাতে ক্রোমিয়াম টাংস্টেন, কোবাল্ট, মলিবডিনাম, এবং ভ্যানেডিয়াম মিশ্রণে ও বিশেষভাবে তাপ পরিচর্যার সাহায্যে।

ইতিবৃত্ত

কোন দেশ কখন কেমন করে লোহা এবং ইস্পাত তৈরি করা শুরু করেছিল তা আজ অনুমানসাপেক্ষ। তবে অতি প্রাচীন কাল থেকেই যে আমাদের দেশেও অতি উচ্চ মানের কৃত কৌশল প্রচলিত ছিল তার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। পুরানো দিল্লির কুতুব মিনারের কাছে মেহারোলী স্তম্ভ তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। তবে, তখনকার চাহিদা ও প্রয়োজন খুব সামান্য থাকায় সেই কৃত কৌশল ব্যক্তির গণ্ডি পার হতে পারেনি। তাই তার ধারাবাহিকতাও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে এবং গবেষকদের হাতে আত্মসমর্পণ করে। এর অনেক কারণের মধ্যে বর্তমানের বিপুল চাহিদা যে অন্যতম তা বোধহয় মানা অসম্ভব নয়।

তবে লোহা এবং ইস্পাত উৎপাদনকারী দেশগুলির অতীত থেকে বর্তমানে উত্তরণের মধ্যে হয়তো একটা যোগসূত্র পাওয়া যেতে পারে এমনিভাবে ঃ

এক ঃ খনি থেকে তোলা অপরিশ্রুত তালকে যথাসম্ভব পরিষ্কার করে বড় বড় গর্তের মধ্যে কাঠ কয়লার সাহায্যে প্রথমে গলিয়ে পরে তাকে পিণ্ড অবস্থায় এনে তা থেকে কাস্তে, হাতুড়ি, বর্শা, তীর, লাঙ্গলের ফলক জাতীয় সরঞ্জাম তৈরি করা হত।

দুই ঃ প্রয়োজন এবং অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সাথে সাথে গর্ত রূপান্তরিত হয় কয়লার উনুনের ধাঁচে বড় বড় ভাটিতে।

তিন ঃ আসে ইংলণ্ডে শিল্প বিপ্লব। ঢেউ আছড়ে পড়ে ইউরোপের বুকে। সাথে সাথে পালটাতে থাকে ভাটির আকার প্রকার।

চার ঃ শিল্প প্রসার জন্ম দেয় নতুন কল-কব্জা, আর ভোগ্য পণ্যের বৈচিত্র্য। এইসব দাবি পূরণ করতে গিয়ে শুরু হয় নতুন চিন্তা এবং নবতর প্রযুক্তির দ্বার উন্মোচিত হয়।

সবই ঘটেছে বহু মানুষের নিরলস প্রয়াসে। এদের মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট হলেন ঃ হেনরি কট, হেনরি বিসিমার, সিডনী এইচ টমাস, পেরি সি গিলক্রিস্ট, ফ্রেডারিক, উইলহেম সিমেন্স, এ্যামিলি, এবং পিয়ারী মার্টিন প্রভৃতি। এই তালিকায় কোন ভারতীয়ের নাম যোগ করতে পারলে গর্ব বোধ করতে পারতাম। না করতে পারার প্রধান কারণ হয়তো ইংরেজ প্রভুত্ব। ওদের সাম্রাজ্যের স্বার্থে যতটুকু প্রয়োজন তার চাইতে বেশি করতে চাইবে কেন! পরোক্ষে যে আমাদের কিছু লাভ হয়নি তা নয়। আমরা প্রায় এক লাফে আধুনিক যুগের সিঁড়িতে পা রাখতে পেরেছি। আমাদের দেশ যেভাবে এগিয়েছে তার একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করছি ঃ

1830 ঃ জোশিয়া মার্শাল হিথ, যাকে আমাদের দেশে আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠার অগ্রণী বলা হয়, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর পোর্টোনোভোতে প্রথম ইস্পাত কারখানা স্থাপন করেছিলেন। তবে এ প্রচেষ্টা আর্থিক সাফল্যের মুখ দেখেনি।

1874 ঃ জেমস আর্সকিন প্রতিষ্ঠা করেন বেঙ্গল আইরণ ওয়ার্কস। কিন্তু, এই প্রতিষ্ঠান 1882 সনে চলে যায় মেসার্স হোড় মিলার এন্ড কোং-তে এবং তার মাত্র তিন বছর বাদে 1885-তে মেসার্স মার্টিন এন্ড কোং-তে।

1899 ঃ জামসেদজি টাটা একটি সম্পূরিত (integrated) ইস্পাত কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। আমাদের দেশে এটাই প্রথম বলা যায়।

1906 ঃ ঐ পরিকল্পনা অনুসারে, বিহারের শাকচিতে টাটা আয়রণ এন্ড ষ্টিল কোং (টিসকো) প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয়। এই শাকচিই বর্তমানে জামসেদপুর বা টাটানগর নামে খ্যাত।

1911 ঃ বার্ষিক মাত্র এক হাজার টন পিণ্ড ইস্পাত উৎপাদনের মাধ্যমে শুরু করলেও মাত্র দু'বছরের মধ্যে উৎপাদন পাঁচ হাজার টনে গিয়ে দাঁড়ায় এবং 1939 সনের মধ্যেই উৎপাদনের হার 15000 টনে পেঁছে যায়।

1918 ঃ প্রতিষ্ঠিত হয় ইণ্ডিয়ান আয়রণ এন্ড ষ্টিল কোং (ইসকো)। 1926 সনে এর সাথে যুক্ত হয়ে যায় বেঙ্গল আয়রণ এন্ড ষ্টিল কোং। প্রথম

দিকে ইসকোর উৎপাদন সীমাবদ্ধ থাকে পিণ্ড লোহা উৎপাদনে ইংল্যাণ্ড ও জাপানে রপ্তানি করার জন্য। ইস্পাত উৎপাদন শুরু হয় 1939 সন থেকে।

1940 -50 : কর্ণাটকের ভদ্রাবতীতে জন্ম লাভ করে মহীশূর আয়রণ এণ্ড ষ্টিল লিমিটেড। এই প্রকল্পে স্যর এম বিশ্বেশ্বরাইয়ার অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে এই কোং-র নাম পালটে বিশ্বেশ্বরাইয়া আয়রণ এণ্ড ষ্টিল লিমিটেড নামে পরিচিতি লাভ করে। গোড়ার দিকে এই কারখানায় ব্যবহার করা হত কাঠ পরিশোধন কারখানায় প্রাপ্ত অঙ্গার। উৎপাদন করত অঙ্গার পিণ্ড লোহা। ধীরে ধীরে শুরু হয় ইস্পাত উৎপাদন। 1945 সনের পর থেকে চালু হয় তাড়িত প্রক্রিয়ায় ইস্পাত উৎপাদন। এই কারখানায় অনেক ধরনের মিশ্র লোহা এবং বিশেষ ইস্পাত উৎপন্ন হয়।

1951 -56 : স্বাধীনোত্তর প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ছিল কৃষিভিত্তিক। নতুন কোন ইস্পাত প্রকল্প জন্মলাভ না করলেও টিসকোকে বার্ষিক উৎপাদন 1 মিলিয়ন টন থেকে বাড়িয়ে 2 মিলিয়ন টনে এবং ইসকোকে 0·5 মিলিয়ন টন থেকে বাড়িয়ে বার্ষিক 1 মিলিয়ন টনে সম্প্রসারিত করার অনুমতি দেওয়া হয়।

কোন নতুন কারখানা স্থাপিত না হলেও 1954 সনের 19 জানুয়ারী এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের মাধ্যমে নথিবদ্ধ হয় হিন্দুস্থান ষ্টিল লিমিটেড (এইচ. এস. এল)। স্থির হয় পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে, উড়িষ্যার রাউরকেল্লায়, এবং মধ্যপ্রদেশের ভিলাইতে তিনটি ইস্পাত কারখানা স্থাপন করা হবে সরকারি আওতায়।

1956 -61 : পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুসারে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে প্রতিষ্ঠিত হয় তিনটি কারখানা ঃ দুর্গাপুরে (ইংরেজ সহযোগিতায়), রাউর-কেল্লায় (জার্মান সহযোগিতায়) এবং ভিলাইতে (সোভিয়েট রাশিয়ার সহযোগিতায়)। উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রা স্থির হয় প্রতি কারখানায় 1 মিলিয়ন টন হিসেবে। মোট 3 মিলিয়ন টন।

1961 -66 : দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালেই স্থির হয় উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে 6 মিলিয়ন টন করা। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হয় তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা কালে। উপরন্তু 1965-তে দুর্গাপুরে স্থাপিত

হয় একটি মিশ্র ইস্পাত কারখানা (এ. এস. পি) যার মাধ্যমে উৎপাদন শুরু হয় কম বেশি আড়াই শতের মত বিভিন্ন ধরনের মিশ্র ইস্পাত। দুর্গাপুর ছাড়াও ভদ্রাবতী কারখানা সম্প্রসারিত হয় কম বেশি একশত ধরনের মিশ্র ইস্পাত উৎপাদন লক্ষ্যে।

এই সময়েতেই আমেরিকা আসরে নামে বোকারোতে একটি ইস্পাত কারখানা স্থাপনের উদ্দেশ্যে। শেষ পর্যন্ত তা ভেস্তে যায়। তবে সোভিয়েট রাশিয়া শূন্যস্থান পূর্ণ করে। 1964 সনের জানুয়ারীতে প্রতিষ্ঠা করে বোকারো ষ্টিল লিমিটেড (বিসল)।

1966-69 : নতুন কিছু না হলেও সামরিক পরিভাষায় এই সময়কে বলা যায় দখলকারী মজবুত করার কাল।

1969 এবং : পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার গতিশলি প্রবাহ ঘটাতে থাকে শিল্প প্রসার এবং লোহা ও ইস্পাতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা। ক্ষুধা মেটাতে শুরু হয় লাইসেন্স প্রদান মিনি কারখানার এবং পুনরাবর্তনের (re-rolling) সুযোগ সৃষ্টি করতে সম্প্রসারণ ফলপ্রসূ করতে প্রয়োজন দেখা দেয় এইসব ইউনিটের মধ্যে সমন্বয় সাধন। এই কথা মনে রেখেই স্থাপিত হয় কেন্দ্রীয় সংস্থা ষ্টিল অথরিটি অব ইণ্ডিয়া (সেইল) (SAIL)। সরকারি পর্যায়ে এই সংস্থাই দিয়ে চলেছে ভারতে ইস্পাত শিল্পের নেতৃত্বে।

সেইল (SAIL) অবশ্য শেষ কথা নয়। কারণ, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি জন্ম দেবে নতুন সমস্যা এবং সমাধান কল্পে নতুন সমাধান চিন্তা। এই বহতা অবস্থাকেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন শক্তি। আমাদের জাতীয় জীবনে এই শক্তি সাধনাই সত্য হোক।

শ্রেণী বিন্যাস

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে ভূত্বকের প্রায় 4·6 শতাংশ ভাগ অধিকার করে আছে আকরিক লোহা এবং একমাত্র ছিটে ফোঁটা উল্কা পিণ্ড ছাড়া লোহা বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় না। এই বিপুল লৌহ ভাণ্ডার ছড়িয়ে আছে পাঁচটি মহাদেশে এবং অনেক দ্বীপে। পরিমাণ এবং গুণগত মান সর্বত্র এক নয়। যার ফলে আমেরিকা এবং জার্মানীর মত উন্নত কিছু দেশও আকরিক লোহা আমদানি করতে বাধ্য হয়—নিজ নিজ দেশে মজুত ভাণ্ডার বিপুল হওয়া সত্ত্বেও।

সুতরাং, সংশ্লিষ্ট সকলের স্বার্থেই আকরিক লোহার শ্রেণী বিন্যাস একান্ত প্রয়োজন। যদিও এ ব্যাপারে অনেক রীতি রেওয়াজ চালু আছে তবু 'পহেলে দর্শনদারী বাদমে গুণ বিচারি' প্রবাদ কিছু অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে বৈকি। বিয়ের জন্য পাত্র-পাত্রী দেখে এলে প্রথম প্রশ্ন—কেমন দেখতে। শুরু হয় গায়ের রং উল্লেখ করে। লোহার বেলাতেও সে রীতি মেনে লোহাকে চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ

রং	নাম	লোহার পরিমাণ শতাংশ
কাল খনিজ ঃ	ম্যাগনেটাইট ঃ (Magnetite)	60—70
লাল খনিজ ঃ	হিমাটাইট ঃ (Hematite)	40—60
বাদামী খনিজ ঃ	লিমোনাইট ঃ (Limonite)	40—60
কার্বন খনিজ ঃ কালো	কার্বোনেট ঃ (Carbonate)	40—50

ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে যার বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায়ঃ একজন মানুষকে চেনা যায় তার সঙ্গী দেখে। সেই বিচারে আকরিক লোহার সঙ্গীদের মধ্যে আছে প্রধানতঃ কিছু ধাতব এবং কিছু অধাতব পদার্থ। ধাতুবিদরা নিজেদের জাতভাই ধাতব অংশটাকে পংক্তি ভোজনে সামিল করে অধাতব অংশকে অনায়াসে খনিজ মল (gaugue) আখ্যায় ভূষিত করে আকরিক লোহার শ্রেণী বিভাগ করলেন এইভাবেঃ

সিলিসাস খনিজ ঃ (Siliceous Ores)	যার খনিজ মলে সিলিকন মুখ্য।
ক্যালকেরিয়াস খনিজ ঃ (Calcareous Ores)	যার খনিজ মল ক্ষার বা চুন প্রধান।
এ্যালুমিনাস খনিজ ঃ Alumenous Ores)	যার খনিজ মল মুখ্যত এ্যালুমিনা যুক্ত।
আরজিল্যাসাস খনিজ ঃ (Argillaceous Ores)	যার খনিজ মল মুখ্যত কর্দম।
বিটুমিনাস খনিজ ঃ (Bitumineous Ores)	যাতে ভাল পরিমাণে গালা বা কয়লা জাতীয় খনিজ মল থাকে।

প্রযুক্তির দিক থেকে অনেক ক্ষেত্রে এতসব বাছ বিচার না করে লোহাকে কেবল দু'শ্রেণীতে চিহ্নিত করলেই চলে। তা হলঃ

এক ঃ ফসফরাস প্রধান খনিজ, এবং

দুই ঃ সালফার প্রধান খনিজ।

জাত বিচারের সাথে সাথে আবার খানদানের প্রশ্ন এসে যায়। এর জবাব খুঁজতে গিয়ে প্রথমেই লৌহ শিল্পে চালু দুটি শব্দের সাথে পরিচয় থাকলে ভাল হয়। তার মধ্যে একটি হল ধাতুমল। এই শব্দটি কিন্তু একটু আগে লেখা খনিজ মল শব্দের সাথে সমার্থক নয়।

ধাতুমল (Slag) ঃ আমরা যা আহার করি তার বড় অংশ হজম হয়ে আমাদের দেহের পুষ্টিসাধন করে। বাকীটা মল, মূত্র, ঘাম প্রভৃতির মাধ্যমে শরীর থেকে বেরিয়ে গিয়ে আমাদেরকে অনেক দুর্গতির হাত থেকে রক্ষা করে। আকরিক বা খনিজ অবস্থায় লোহার সঙ্গে কিছু অপবস্তু থাকে যা লৌহ পিন্ড উৎপাদনের সময় আলাদাভাবে বার করে দিতে হয়। এই অপবস্তুর সমাহারকেই ধাতুমল বলা হয়।

দ্বিতীয় শব্দটি হল বিগালক (Flux) ঃ শক্ত পিণ্ড আকরিক লোহাকে সহজে বিগলিত তরল অবস্থায় আনতে খনিজ লোহার সাথে কিছু বস্তু মিশিয়ে দিতে হয়। এই বস্তু সমাহারকেই বলা হয় বিগালক।

মানদান বিচার ঃ

লৌহ শিল্পে মনুষ্য সমাজের মত জাতের নামে কোন বজ্জাতি না থাকলেও, প্রয়োগ কৌশলে সাফল্য অর্জন করার জন্য প্রয়োজন খনিজ লোহার সঠিক মূল্যায়ন। বিচার্য বিষয়গুলির মধ্যে যা যা প্রাধান্য পায় তা হল ঃ

এক ঃ খনিজ অবস্থায় লোহার শতাংশ ভাগ কত।

দুই ঃ খনিজের গঠন শৈলী।

তিন ঃ খনিজ/ধাতুমল সংযুতি।

চার ঃ খনিজ অবস্থায় লোহা ক্ষার/চুন বা এ্যাসিড প্রধান কিনা।

পাঁচ ঃ এ্যালুমিনা বা ফসফরাসের উপস্থিতি ; এগুলি থাকলে উৎপাদনের সময় পিণ্ড লোহার সাথে একাকার হয়ে যায়। পরে ইস্পাত উৎপাদনের সময় বিশেষ ব্যবস্থা প্রয়োগ করতে হয়।

ছয় ঃ খনিজ অবস্থায় সালফারের উপস্থিতি। উৎপন্ন পিণ্ড লোহায় সালফার থেকে গেলে সে লোহা গনগনে অবস্থায় ভঙ্গুর প্রবণ (red short) হয়। সুতরাং, গোড়াতেই খনিজকে ভস্মীকরণ (calcining) প্রক্রিয়ায় সালফার মুক্ত করে নিয়ে লোহা উৎপাদন কার্যে হাত দিতে হয়। অথবা চুল্লীতে

খনিজের সাথে প্রচুর পরিমাণে চুন বা ম্যাঙ্গানিজ যোগ করে নিতে হয়। চুন সালফারকে শুষে নেয়, আর ম্যাঙ্গানিজের সাথে সালফার ধাতুমল রূপে দ্রব হয়ে যায়।

আহরণ এবং উৎপাদনমুখী যাত্রা

আকরিক লোহার আহরণ এবং পরবর্তী পর্যায়ের ব্যবস্থা খনির ভূতাত্ত্বিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। খনি বলতে আমরা মাটির তলাকার অন্ধকারময় পরিবেশকেই বুঝি। কিন্তু, আমাদের দেশসহ পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র আকরিক লোহার বিরাট বিরাট পাহাড় আকাশে হেলান দিয়ে কোটী কোটী বছর ধরে নিদ্রায় মগ্ন আছে। নিদ্রাভঙ্গ করতে প্রথমে উপরের স্তরে অনেক উঁচু উঁচু ধাপ সৃষ্টি করে গ্যাস চালিত হাতুড়ি ছিদ্রক (Pneumatic hammer drill) দিয়ে গর্ত করে তার মধ্যে বিস্ফোরক দ্রব্য ঢুকিয়ে অগ্নি-সংযোগ করা হয়। আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বিস্ফোরণ ঘটে। খসে পড়ে কম বেশি হাজার দশেক টনের মত ঢাউস ঢাউস পিণ্ড এক একটি বিস্ফোরণের পর। এইসব পিণ্ড যন্ত্র চালিত খোদাই সাফলের (excavator) সাহায্যে এবং পরিবহণ বলয় মারফত উপরের দিকে অপেক্ষমান অতিকায় এক পীড়ন যন্ত্রের (chrusher) পেটে চলে যায়। এবার বড় বড় পিণ্ডগুলি পঁচিশ সেণ্টিমিটার আয়তনের মত ছোট ছোট টুকরোয় রূপান্তরিত হয় এবং ছাকুনি মারফৎ ঐ টুকরোগুলি নীচে অপেক্ষমান রেল ওয়াগনে চাপানো হতে থাকে। নির্দিষ্ট সংখ্যক ওয়াগন ভরতি হলেই শুভলগ্নে যাত্রা শুরু হয় গন্তব্য অভিমুখে। আমাদের দেশে বেশির ভাগই যায় বিভিন্ন কারখানার দিকে। বাকি অংশ বন্দরে জাহাজ বোঝাই হয়ে সমুদ্র পাড়ি দিতে ভিন দেশের ক্ষুধা মিটাতে। যেখানে আকরিক লোহার অবস্থান মাটির তলায়, সেখানে প্রথমে তলায় একটা ছোট ঘরের মত বানিয়ে ঘরের দেওয়াল ফুটো করে বিস্ফোরক ঢোকান হয় এবং অগ্নি সংযোগের সাহায্যে আকরিক পিণ্ড আলগা করার কাজ চলতে থাকে। মাটির উপরে গর্তের মুখে বসান থাকে একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র। যারা পাহাড়ি এলাকায় রোপওয়েতে চেপেছেন তারা দেখেছেন কেমন করে দুটো পালকি মোটা লোহার তারের সাহায্যে ওঠানামা করে। একটা পালকি যখন উপরের দিকে উঠতে থাকে আরেকটা তখন নামতে থাকে নীচের দিকে। ভাবতেও অবাক লাগে যে মাল বোঝাই, মাল খালাস এবং পালকি ওঠানামা এক এক দফায় এক মিনিটেও লাগে না। চারদিকে উড়তে থাকে ধুলো

আর ধুলো। কিন্তু, যিনি এই কর্মকাণ্ডের পরিচালক তিনি এই ধুলো বালির কোন ধারই ধারেন না। কেননা, তিনি সবকিছু চালনা করেন একটি আরামদায়ক নিয়ন্ত্রণ কক্ষে বসে। তার সামনে যান্ত্রিক ফলকে ফুটে ওঠে ইলেকট্রনিক সংকেত। সেইমত তিনি শুধু বোতাম টিপেই প্রায় বিনা পরিশ্রমে সমগ্র ব্যবস্থা চালু রাখেন।

পরিচর্যা

মানব শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পরই ধাত্রী তাকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে মায়ের কাছে শুইয়ে দেন। প্রাথমিক অবস্থায় আকরিক পিণ্ডের সাথে মিশে থাকে বেশ ভাল পরিমাণে মাটি আর পাথর। উৎপাদনে বিঘ্ন সৃষ্টি ছাড়াও এরা মাল বোঝাই, খালাস এবং পরিবহণ ব্যয় বৃদ্ধি করে। সুতরাং, প্রাথমিক পর্যায়ে চলে ঝাড়াই বাছাই। দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রাপ্ত খনিজকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করে নিতে হয়। কারণ, বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত খনিজের শ্রেণীগত পার্থক্য থাকতে পারে। আবার, দেখা গেছে বিশেষ একটি শ্রেণীতেও মানের তারতম্য থাকে—যেমন, একই শ্রেণীতে পাঠরত সব ছাত্র-ছাত্রী সমমানের হয় না। এই পার্থক্য জানা না থাকলে উৎপন্ন লোহার পরিমাণ এবং মান দুটোতেই হেরফের ঘটে। খনিজ লোহার ক্রেতা এবংবিধ মাল নিশ্চয় কিনতে চাইবেন না। সুতরাং, খনি চত্বরেই শ্রেণী এবং মান অনুযায়ী ওয়াগনগুলি ভরতি করা হয়। পরে তারা সামিল হয় যাত্রার মিছিলে।

আমাদের দেশে বেশির ভাগ খনিজ লোহাই চলে যায় সরাসরি কারখানা চত্বরের মাল গুদামে। নয়ত, মারুত চুল্লীর (Blast Furnace) পেটে ঢালবার জন্য বাংকারে। কিছু পরিমাণ অবশ্য চলে যায় বন্দরে জাহাজ বোঝাই হয়ে বিদেশে রপ্তানির জন্য।

আমাদের দেশে রেল ওয়াগন থেকে জাহাজে মাল বোঝাই কর্মকাণ্ড তেমন জটিল নয়। কিন্তু, উন্নত দেশে, যেখানে বছরে কোটি কোটি টন খনিজ লোহা আমদানি-রপ্তানি হয়ে থাকে, সেখানে গোটা কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় স্বয়ংক্রিয় বোতাম টেপা (Push Button) প্রক্রিয়ায়। অতিকায় সব যন্ত্রপাতি, মাল খালাস, ত্রুটি বিচ্যুতি সবই পরিচালনা করেন মাত্র একজন মানুষ অতি আরামদায়ক ঘরে বসে।

এইসব অতিকায় যন্ত্রপাতি, বিশালদেহী জেটি, ক্রেন, পরিবহণ বলয়, পাইপ

সবই কিন্তু লোহা বা ইস্পাত থেকেই তৈরি। সমগ্র সৃষ্টি প্রবাহই তো এই নিয়মে চলে। মানুষ জন্ম দেয় মানুষকে, মনুষ্যেতর জলচর, স্থলচর, নভচর জন্ম দেয় নিজ নিজ প্রজাতিকে এবং গাছপালা গাছপালাকে।

পরিচর্যার দ্বিতীয় পর্ব।

কারখানা চত্বরে নিয়ে আসা খনিজ লোহায় অনেক অপবস্তু থাকে। সুতরাং, উৎপাদন পর্ব শুরু করার আগে আর একবার শোধনের কাজ করতে হয়। প্রক্রিয়া নানাবিধ ঃ চূর্ণ করা, ছাকা, ঝলসান, ধোলাই করা, এবং চুম্বকের সাহায্যে আলাদা করা। সব খনিজকেই যে সব প্রক্রিয়ার শিকার হতে হবে তার কোন মানে নেই। সবই নির্ভর করে ঃ

এক ঃ আকরিক লোহা কোন মানের।

দুই ঃ অপবস্তুর জাত এবং পরিমাণ কত, এবং

তিন ঃ উৎপন্ন লোহা কোন কাজে লাগবে।

এত করেও কিন্তু আকরিক লোহা সম্পূর্ণ অপবস্তু মুক্ত হয় না। তবে যা হয় তাও মন্দ নয়। কেননা, অন্যান্যদের মধ্যে এতে ভালমাপের জ্বালানি কোক কয়লার সাশ্রয় হয়।

পরিচর্যার তৃতীয় পর্ব

মারুত চুল্লীতে সুশৃংখলভাবে কাজ পরিচালনার জন্য আকরিক লোহার সমীকরণ (homogenising) বিশেষ জরুরী। চুল্লীতে কর্মরত ইঞ্জিনিয়ার, এবং কর্মীদের প্রধান লক্ষ্য থাকে যেন চুল্লীতে ব্যবহৃত লোহা সম সংযুতি এবং সম মাপের হয়। সংযুতি সমীকরণ খানিকটা দুগ্ধ প্রকল্পে অনেক রকমের দুধকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় কোন একটি বিশেষ মানে (standard milk) নিয়ে আসার মত। মাপ সমীকরণ করতে আকরিক লোহাকে বিশেষ যন্ত্রে চূর্ণ করে বিভিন্ন মাপের ছাকনির সাহায্যে ডেলাগুলি আলাদা আলাদা পাত্রে রাখা হয়। চূর্ণ প্রক্রিয়া চলার সময় ভাল পরিমাণে সূক্ষ্ম এবং অতি সূক্ষ্ম খনিজ কণা জমে যায়। এগুলি মারুত চুল্লীতে সোজাসুজি ব্যবহারের অযোগ্য। ফেলে দিলেও বিপুল ক্ষতি। তাই, এইসব কণা সিনটারিং (sintering) নামক এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় পিণ্ডীভূত (agglomerate) করা হয় ঃ জমা কণার সাথে পরিমাণ মত দাহ্য বস্তু মিশিয়ে একটা বিশেষ ধরনের পাত্রে রেখে তার মধ্যে গরম হাওয়া ঢোকান হয়। পাত্র মধ্যকার মিশ্রিত মাল এই গরম হাওয়া শোষণ করতে থাকে।

শুরু হয় ভর (mass) মধ্যেকার দহন ও উপক্রান্তা (incipient) গলন। এই প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত তাপ খনিজ কণাকে সরন্ধ্র পিণ্ডে পরিণত করে।

লোহা উৎপাদনে এই প্রক্রিয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনেক দেশে বেশ কিছু কারখানা লোহা উৎপাদনে এই জাতীয় পিণ্ডই শুধু ব্যবহার করে থাকে। প্রতি সম্পূরিত (integrated) ইস্পাত কারখানাতেই সিনটারিং ব্যবস্থা থাকবেই থাকবে।

সব কণা সিনটারিং করা যায় না। এসবও ফেলা যায় না। এগুলিও ভাল করে পিষে একেবারে ছাতুর মত করে সামান্য ভিজিয়ে নিতে হয়। প্রয়োজনে বিঁটোনাইট (bentonite) এবং গুঁড়ো পাথুরে চুন মিশিয়ে একটা আবর্তমান ড্রামের সাহায্যে গুলে পরিণত করা হয়। পরে এই গুল প্রায় 1100° সেলসিয়াস উত্তাপ প্রয়োগ করে শক্ত করা হয়। কারখানার ভাষায় এই গুলকে বলে পেলেট (pellet)।

পরিচর্যার চতুর্থ পর্ব ঃ

অনেক সময় নিম্নলিখিত দুটি কারণে ঃ

এক ঃ খনিজের ভৌত ধর্মের উন্নতি সাধন করে নিতে হয়—

১। জল নিষ্কাশন করে,

২। কার্বন ডাই-অক্সাইড বিতাড়িত করে, এবং

৩। ঘন খনিজের শোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

দুই ঃ বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়ার জন্য চৌম্বক সমাহরণ (magnetic concentration) করে। কারণ, চূর্ণ করা খনিজের সাথে অনেক সময় অচৌম্বক অপবস্তু মিশে থাকে। এইসব অপবস্তু অপসারণ করতে ব্যবহৃত হয় অতি শক্তিধর চুম্বকযুক্ত আবর্তমান ড্রাম। অচৌম্বক বস্তু সহজেই আলাদা হয়ে যায়।

আকরিক লোহার রূপান্তর

আকরিক লোহাকে ব্যবহার যোগ্য লোহায় রূপান্তরিত করতে যেসব ভি. আই. পি. গোছের বস্তুর দরকার হয় তার মধ্যে তিন প্রধান হল—চুন, কোক কয়লা, এবং বাতাস (মারুত)। এদেরকে আমরা মোটামুটিভাবে চিনি। তবে লোহা উৎপাদনের ব্যাপারে তার চাইতে একটু বিশেষ পরিচয়ের অবশ্যই প্রয়োজন।

চূন

গৃহিনীরা রোজই কয়লার উনুনের ছাই ঝেড়ে সাফ করে নেন। কিন্তু, মারুত চুল্লীতে জ্বালানি কোক কয়লার ছাই সেভাবে সাফ করা যায় না। উপরন্তু, গোদের উপর বিষ ফোড়ার মত চুল্লীর পেটের মধ্যে বিগলিত লোহায় পরিহার্য কিছু ধাতুমল থাকে। এই সমস্যা মেটানর একটাই পথ। এবং তা হচ্ছে, চুল্লীর পেটের মধ্যে সব বর্জ্য পদার্থকে তরল ধাতুমলে পরিণত ক'রে বিগলিত তরল লোহার উপরে ভাসমান রাখা, এবং তরল ধাতুমলকে আলাদা-ভাবে চুল্লী থেকে বার করে আনা। করতে না পারলে চুল্লী অচিরেই অকেজো হয়ে পড়বেই। এই প্রক্রিয়ার প্রধান সহায়ক বিগালক হচ্ছে চুন। এই চুন যথাসম্ভব পরিশুদ্ধ হ'তে হবে। সামান্য জিপসাম (gypsum) থাকলেও খুব ক্ষতির কারণ হয়। কেননা, জিপসামের সালফার ভাগটুকু উৎপন্ন পিণ্ড লোহায় একাত্ম হয়ে গিয়ে পরবর্তী পর্যায়ে অনেক ঝামেলার নাটের গুরু হয়ে থাকবে।

পাথুরে চুনও কিন্তু বিশাল বিশাল আকাশ ছোঁয়া পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে থাকে। আহরণ এবং পরিবহণ আকরিক লোহার মতই। তবে গন্তব্য সম্পূরিত ইস্পাত কারখানায় পৌঁছবার পূর্বে এরা যায় চুনা ভাটিতে। এখানে চুন চুর্ণ করার পর যায় কারখানায়।

কোক কয়লা-গ্রিড গ্যাস-উপজাত

মারুত চুল্লীতে লোহা উৎপাদনের জন্য চাই তাপ এবং কার্বন। দুটোই সরবরাহ করে কোক কয়লা। খনিজ লোহা এবং তার বিগালকের সাথে এই কোক কয়লাও মারুত চুল্লীতে ঢালা হয়।

এ কাজে শক্ত কাঁচা কয়লার বদলে কোক কয়লাই জলচল। কেননা, একেতো বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কাঁচা কয়লা, চুল্লীর ভেতর জ্বলে গিয়ে আঁকশে পিঠের মত হয়ে যায়। ফলে বিঘ্ন সৃষ্টি করে চুল্লী পরিচালনায়। দ্বিতীয়ত, কাঁচা কয়লা সহজ দাহ্য হওয়ায় তাপমান হয় কোক কয়লার চাইতে কম। তৃতীয়ত, কাঁচা কয়লাকে কোক কয়লায় রূপান্তরিত করতে গিয়ে মূল্যবান গ্যাস এবং উপজাত পাওয়া যায়। সুতরাং, আমরা বঞ্চিত হতাম কাঁচা কয়লার এইসব উদবায়ী (volatile) উপাদান থেকে।

কোক বানান হয় একাধিক ব্যাটারি মাধ্যমে। প্রতিটি ব্যাটারি কমবেশি 70টির মত কক্ষ সমন্বয়ে তৈরি। প্রতিটি কক্ষ কম বেশি। 11 মি. লম্বা, 3·5 মি. উচ্চ, এবং 0·5 মি. চওড়া। কক্ষগুলি বক যন্ত্রের (retort) মত। দুর্গল (refractory) ইটে তৈরি। প্রতি দুটি কক্ষের মধ্যে দুর্গল ইটে গড়া একটি কক্ষ থাকে। এই কক্ষের মধ্যে বসান হয় বেশ কয়েকটি গ্যাস দীপ (burner)। প্রথমে এই দীপ জ্বালিয়ে এই কক্ষগুলি উত্তপ্ত করতে হয়। এই উদ্গত তাপ সঞ্চারিত হয় কোকের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে।

প্রতিটি কক্ষের ছাতে, সুবিধাজনক দূরত্বে, চারটির মত ঢাকনা থাকে। এগুলি যান্ত্রিক উপায়ে খোলা এবং বন্ধ করা যায়। কক্ষগুলির ছাতের উপরে বসান রেল লাইন দিয়ে কাঁচা কয়লা বোঝাই গাড়ি ব্যাটারির এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত চলাচল করতে পারে। ব্যাটারির এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকে গুঁড়োর কয়লার বিশাল মজুত ভাণ্ডার। পরিমাণে কম করেও 3000 টনের মত। এখানে মজুত করার আগে কাঁচা কয়লাকে ভাল করে চূর্ণ করে মিলমিশ (blending) খাইয়ে নিতে হয় যাতে উৎপন্ন কোক সমমানের হতে পারে।

ভাণ্ডার থেকে নিয়ে গাড়ি বোঝাই করে চালক রেল লাইনের উপর দিয়ে গাড়িটা এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন। খালি কক্ষের উপরে এসে গাড়ি থামিয়ে দেন। এবারে, কক্ষের উপরের ঢাকনা এবং গাড়ির মেঝে যান্ত্রিক উপায়ে খুলে যায়। ব্যাটারি কক্ষে কয়লা ভরতি হলেই গাড়ির মেঝে এবং কক্ষের ঢাকনা বন্ধ করে গাড়িটা সামনের দিকে এগিয়ে যায় পরপর কক্ষগুলি কয়লা ভরতি করার জন্য।

ব্যাটারির বাইরে-পেছনের দিকে-একটা ঠেলা যন্ত্র থাকে। এই যন্ত্রের সাথে যুক্ত থাকে আগু-পিছু করবার একটা লম্বা হাতল। এই হাতলের সাহায্যেই কক্ষের ভেতরকার রাশীকৃত গুঁড়ো কয়লা সমতল করা হয়। ঠিক যেমন গৃহস্থ উঠোনে ঢিপি করে ধান ঢেলে তা সযত্নে হাত দিয়ে নেড়েচেড়ে বিছিয়ে দেন।

কক্ষস্থ কয়লা কোকে পরিণত হতে 20 থেকে 24 ঘণ্টা সময় লাগে। সুতরাং, 70 কক্ষ বিশিষ্ট ব্যাটারির প্রতি তিনটি কক্ষ এক এক ঘণ্টায় ভরতি এবং খালি করার চক্র চলতে থাকে। কাঁচা কয়লা গনগনে লাল কোক তালে পরিণত হবার পর কক্ষের আগু-পিছু দুটো দরজা খুলে দেওয়া হয় যান্ত্রিক উপায়ে। এবার পেছনে অপেক্ষমান ঠেলা যন্ত্রটি কোক তালে ধাক্কা মারতে থাকে। ফলে কোকের তালটা টুকরো টুকরো হয়ে ঝর ঝর করে ঝরে পড়ে একটা গাড়িতে। কাল বিলম্ব

না করে গাড়িটাকে ঢুকিয়ে দেয়া হয় একটা তাপ নিবারণী টাওয়ারে। অনেকগুলি ফোয়ারার সাহায্যে জল সিঞ্চন করে কোক ঠাণ্ডা করা হয়। এ কাজে সামান্য বিলম্ব হলেই তপ্ত লাল কোক বাতাসের সংস্পর্শে এসে দাউ দাউ করে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। ঠাণ্ডা হবার পর যান্ত্রিক উপায়ে পরিবহন বলয়ের মাধ্যমে ছাঁকনির সাহায্যে অতি ক্ষুদ্র কোক আলাদা করে রেখে বাকিটা চলে যায় মারুত চুল্লীর মালখানায়।

কবিতায় পড়েছি কয়লা হৃদয় গলি হীরে হয়। হীরে রত্ন এবং তা সাধারণ মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। তবে, কয়লা প্রকৃত অর্থেই রত্ন গর্ভা। কাঁচা কয়লা কোকে রূপান্তরিত হবার সময় যে গ্যাস উদ্গিরণ করে তা যে কেবলমাত্র ইস্পাত প্রকল্পে নানাভাবে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার ঋরা হয়, তাই নয়। উপজাত হিসেবে এই গ্যাস থেকে আমরা যে কত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পাই তার ঠিকানা নেই। আলকাতরা, পীচ, ন্যাপথালিন, রং, যন্ত্রে লাগাবার তেল (lubricant), কৃত্রিম রেজিন, নাইলন পারলন জাতীয় কৃত্রিম তন্তু, বিস্ফোরক দ্রব্য, কীট নাশক ওষুধ, প্লাস্টিক শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচা মাল, ওষুধ শিল্পের জন্য ঃ এ্যাসপিরিন, সালফেনোমাইড, কৃত্রিম ভিটামিন, সেলিসাইলিক এ্যাসিড। তালিকা আরও দীর্ঘ। বর্তমানে ওষুধ, প্লাস্টিক এবং রাসায়নিক সহ অনেক শিল্পে যে রমরমা ভাব লক্ষ্য করা যায় তাতে কাঁচা কয়লাজাত গ্যাসের ভূমিকা মুখ্য। অন্যভাবে বলা যায় যে ইস্পাত শিল্পে যদি মন্দা দেখা দেয় তবে কয়লার ব্যবহার কমতে বাধ্য। ফলে দেশের শিল্প জগতে এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। শুধু কি ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, কৃষি ক্ষেত্রেও এর প্রভাব অপরিমেয়। উপজাত হিসেবে গ্যাস থেকে যে সারের উপাদান পাওয়া যায় তার উপর ভিত্তি করে রাউরকেল্লা ইস্পাত প্রকল্পের সাথে সাথে গড়ে উঠেছে একটা বড় মাপের সারকারখানা। এতসব কারণেই অনেক শিল্প মালিককে ধর্না দিতে দেখা যায় কোক ওভেন ব্যাটারিতে কাঁচামাল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। অনেক উন্নত দেশে এই গ্যাসই পরিশ্রুত হয়ে পাইপের মাধ্যমে চলে যায় দূর দূর শহরে বন্দরে গৃহস্থালি এবং নানা শিল্পে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের জন্য।

চুল্লীর মারুত

কয়লার উনুনে আঁচ দিতে মাঝে মধ্যে হাওয়া করতে হয়। কিন্তু, তার পরিমাপের অঙ্ক নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। কিন্তু, মারুত চুল্লীতে বিপুল পরিমাণ কোক

কয়লার আঁচ দিতে যা প্রয়োজন তা পবননন্দন ভীমকেও বুঝি ছাড়িয়ে যায়। হিসেব মতে প্রতি এক টন উৎপন্ন পিণ্ড লোহার জন্য 2500 ঘন মিটার (90 হাজার ঘন ফুট) থেকে 3100 ঘন মিটার (110 হাজার ঘন ফুট) মত হওয়ার প্রয়োজন হয়। অনেক মারুত চুল্লীই দৈনিক 1000 টন পিণ্ড লোহা উৎপাদন ক্ষমতা যুক্ত। সুতরাং, দৈনিক খরচের পরিমাণটা গিয়ে দাঁড়ায় 0·3 কোটি ঘন মিটার (11 কোটি ঘন ফুট)-এর চাইতেও সামান্য বেশি। দাঁড়িপাল্লায় ওজন করলে প্রায় 4 হাজার টন। ব্যাপার বুঝুন, এই অঙ্কটা চুল্লীর মধ্যে ঢালা কাঁচা মালের চাইতেও ওজনে বেশি। অন্য হিসেবে 1 হাজার টন উৎপন্ন পিণ্ড লোহার প্রায় চার গুণ। একবার ভেবে দেখুন, যে কারখানায় একাধিক মারুত চুল্লী চালু আছে—রাউরকেল্লা ইস্পাত কারখানাতেই চারটি মোট 4·5 হাজার টন ক্ষমতাযুক্ত চুল্লী চালু আছে—সেখানে কী অবিশ্বাস্য পরিমাণ হাওয়ার দরকার! অন্য ভাবে বলা যায় জীব জগতের মত ইস্পাত শিল্পও হাওয়া ছাড়া বাঁচতে পারে না।

এবার ভাবা যাক এর ব্যবহার প্রণালী।

চালু অবস্থায় মারুত চুল্লীর বাইরে ভেতরে গড়ে উঠে প্রবল বাধা। সেই বাধা অতিক্রম করে হাওয়া প্রবেশ করাতে হয় বেশ সংনমিত (compressed) অবস্থায়।

বাইরের হাওয়া যেমনটি তেমন অবস্থায় ব্যবহারের অযোগ্য। কারণ, এই হাওয়া চুল্লীর ভেতরকার তাপাংক কমিয়ে দেয় এবং উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটায়। এসব ভজকট এড়াতে প্রথমে হাওয়া গরম করা হয় কুপার (উদ্ভাবনকারীর) নামানুসারে—বা সমজাতীয় ষ্টোভে। এইসব ষ্টোভ দেখতে অতিকায় বেলনের মত। পেটের ব্যাস আট মিটার—প্রায় 26 ফুট। মাথায় মারুত চুল্লীর সমান। তৈরি হয় দুর্গল বস্তুতে। ভেতরে গ্যাস এবং হাওয়া টানবার জন্য দুটো আলাদা ফুটো থাকে। চুল্লী থেকে নির্গত গ্যাস নির্দিষ্ট নল মাধ্যমে চালিত হয়ে দহন প্রক্রিয়ায় (combustion) বেলনের ভেতরের গা প্রচণ্ড মাত্রায় উত্তপ্ত করে তোলে। নির্দ্ধারিত তাপাঙ্ক মাত্রায় পেঁছলেই গ্যাস প্রবাহ বন্ধ করে হাওয়া ভেতরে টানা হয় উল্টো স্রোত প্রবাহে। এক থেকে দেড় ঘণ্টার মধ্যেই হাওয়ার তাপাঙ্ক মাত্রা প্রায় 1 হাজার ডিগ্রী সেলসিয়াসে থেকে 11 শত ডিগ্রী সেলসিয়াস পেঁছে যায়। এই তপ্ত হাওয়াই মারুত চুল্লীতে প্রবেশ করান হয় ঝাপটা মেরে।

প্রতি মারুত চুল্লীর জন্য তিনটি করে ষ্টোভ নির্দিষ্ট থাকে। প্রথমটির

গ্যাস প্রবাহ বন্ধ করে দ্বিতীয়টির মুখ খুলে দেবার ব্যবস্থা। প্রথম ষ্টোভের হাওয়া নির্ধারিত তাপাঙ্ক মাত্রার নীচে নামতে নামতে দ্বিতীয় ষ্টোভটি চালু করার মত অবস্থায় এসে যায়। মারুত চুল্লীর হাওয়া প্রবাহ অব্যাহত থাকে। তৃতীয় ষ্টোভটির ভূমিকা মুশকিল আসানের (Stand by)। বলাই বাহুল্য এটিও তপ্ত হাওয়া ভরতি অবস্থাতেই থাকে। হালফিলে অতি মাত্রার তাপরোধী ইস্পাত উদভাবিত হয়েছে। ফলে কোথাও কোথাও এই ষ্টোভ দুর্গল বস্তুর বদলে ইস্পাতেই তৈরি হচ্ছে। ভেতরে থাকে কুণ্ডলীকৃত হাওয়া প্রবাহের নল অবশ্যই আলাদা ভাবে ; এবং জ্বালানি গ্যাসের দহন ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় সুবিধা হল এই যে হাওয়া এবং গ্যাস প্রবাহ একই সাথে চালু রাখা সম্ভব। দুর্গল বস্তুতে তৈরি দুটো ষ্টোভের প্রয়োজন একটাতেই মেটান যায়।

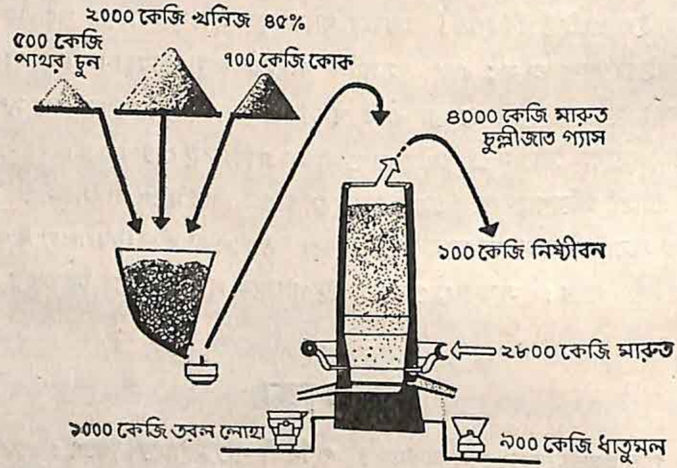
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মারুত চুল্লী থেকে বেরিয়ে আসার মুখে গ্যাসের সাথে মিশে থাকে নানা আবর্জনা যা জমে গিয়ে হাওয়া নল মুখ বা দীপ (burner) মুখ বন্ধ করে দিতে পারে। সুতরাং, প্রথমেই এই গ্যাসকে পরিশ্রুত করে নিতে হয়।

মারুত চুল্লী

পাঁচ অঙ্কটা কেমন যেন অর্থবহ। পৃথিবী পাঁচ মহাদেশে বিভক্ত। পঞ্চেন্দ্রিয় আমাদের দেহে দৌরাত্ম করে। আবার মৃত্যুর পর পঞ্চভুতেই দেহ বিলীন হয়ে যায়। কুকথায় পঞ্চমুখ তো স্বয়ং শিব। কে না পঞ্চশরে জর্জরিত হয়। বাগদেবীর পূজা হয় শ্রীপঞ্চমীতে। তালিকা আর দীর্ঘ না করে কাজের কথায় এসে বলা যাক ঃ পাঁচের মাহাত্মে প্রভাবিত হয়েই বুঝি মারুত চুল্লীর গঠন পাঁচটি বিশিষ্ট অংশে ঃ সর্ব নিম্নে বেলনাকৃতি মেঝে (hearth), এখানে এসেই বিগলিত তরল লোহা এবং ধাতুমল জমা হয় ; ঠিক তারই উপরে আরও একটু বেশি মোটা যে অংশ তার নাম বশ (bosh)। এর উপরে অবস্থিত পর পর পেট (belly) ও মালাধার (stack)। এদের উপরের অংশ ক্রমে সরু হয়ে যে আকারে পরিণত হয় তার নাম গলা (throat)। খাদ্য যেমন গলা দিয়ে পেটে যায়, তেমনি সমস্ত কাঁচামাল—একমাত্র হাওয়া ছাড়া এই গলা দিয়েই মারুত চুল্লীতে ঢালা হয়।

দৈনিক এক হাজার টন উৎপাদন ক্ষমতা যুক্ত এক একটি গণ্ডে পিণ্ডে অতিকায় মারুত চুল্লীর কার্যকরী উচ্চতা কম বেশি সাতাশ মিটার প্রায় ৪৪ ফুট।

তলাকার মেঝের ব্যাস কম বেশি 7·5 মিটার—প্রায় 25 ফুট। মাল ধারণ ক্ষমতার পরিমাপ 1 হাজার ঘন মিটার। যেসব মারুত চুল্লীর দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা দেড়, দুই, তিন এমন কি বার হাজার টন পর্যন্ত— শেষ মাপের চুল্লী অবশ্য আমাদের দেশে চালু নেই—সেসব চুল্লীর জন্য চাই সেই অনুপাতে বেশি কাঁচামাল। সুতরাং, বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে সেসব চুল্লীর আয়তন আরও বেশি বড়। (চিত্রের সাহায্যে দেখান হল)



মারুত চুল্লী মারফত প্রতি ১০০০ কেজি তরল লোহা উৎপাদনের মোটামুটি চিত্র।

চুল্লীর ভেতরে দিবারাত্র চলতে থাকে দাবদাহ, গ্যাস এবং বিগলিত বস্তুর রাসায়নিক বিক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। সুতরাং, এত সব বিরূপ অবস্থার সাথে মানিয়ে চলার মত করেই তৈরি করতে হয় চুল্লীর দেহটা। আর তা হয় বিশেষ ধরনের দুর্গল ইটে (refractory bricks)। এই জগদ্দল চুল্লীকে ভেতরে বাইরে অনেক চাপ এবং ঝড়-ঝাপটার মোকাবিলা করতে হয়। তাই চারদিক ঘিরে নানা শক্ত-কাঠামো বানিয়ে চুল্লীকে সুরক্ষিত রাখবার অনিবার্য ব্যবস্থা করতে হয়।

কয়লার উনুনে আঁচ দেবার জন্য তলার দিকে সামান্য একটা ফোকর থাকলেই চলে। কিন্তু, মারুত চুল্লীতে আঁচ দিতে তপ্ত বাতাস ঢোকান হয় যাকে বলে টুইয়ার (tuyere)-এর মাধ্যমে। এগুলি তামার তৈরি। ব্রোঞ্জ কিংবা ঢালাই লোহার বাক্সে বন্দী থাকে ঠাণ্ডা জলের প্রবাহের মধ্যে। নইলে প্রচণ্ড তাপে টুইয়ার গলে যাবেই যাবে। চুল্লীর মেঝের উপরের দিকে চারদিক ঘিরে সম দূরত্বে প্রায় 18টি টুইয়ার বসান থাকে হাজার টনী চুল্লীতে। মেঝে এবং তার

উপরের অংশে তাপাঙ্ক মাত্রা 1800° সেলসিয়াস মত হয়। এই অবস্থাকে বাগে রাখতে কম করে শ-চারেক শীতলকারী বাক্স চুল্লীর দেওয়ালের ভেতরে গেঁথে দেওয়া হয়। বাইরে উপরের দিকটায় ঠাণ্ডা হাওয়া প্রবাহ এবং জল সিঞ্চনের ব্যবস্থা থাকে। এক একটি হাজার টনী চুল্লীর জন্য দৈনিক প্রায় 1 কোটি টনের মত জল লাগে।

চুল্লীর ভোজন পর্ব

কত ধানে কত চাল হয় তা নাকি অনেকেই জানেন। এটা অবশ্য রাগের কথা। তবে কত পরিমাণ খনিজ লোহা থেকে কী পরিমাণ পিণ্ড লোহা পাওয়া যেতে পারে তার একটা হিসাব পণ্ডিতরা অবশ্যই করে রেখেছেন। এক হাজার টন দৈনিক উৎপাদনকারী চুল্লীর জন্য হিসাবটা সাধারণতঃ এমনি ঃ

এক ঃ কি জাতের লোহা এবং কোন্ মানের পিণ্ড লোহা চাই, সেই নিরিখে খনিজ লোহা লাগবে কমবেশি দু' হাজার টন,

দুই ঃ সাত শত টন কোক কয়লা,

তিন ঃ পাঁচ শত টন পাথর চুন, এবং

চার ঃ পরিমাণ মত ডলোমাইট (dolomite), খনিজ ম্যাঙ্গানিজ, কোয়ার্জাইট (quartzite), এবং বর্জ্য লোহা।

মোট মালের পরিমাণ 3200 টনেরও বেশি। প্রতি রেল ওয়াগনে গড়ে 20 টন মাল ধরলে দিনে 160টি ওয়াগন বোঝাই মাল লাগে। যে কারখানায় তিন চারটে চুল্লী চালু আছে সেখানে কী বিপুল পরিমাণ পরিবহণ সমস্যার মোকাবিলা করতে হয় তা সহজেই অনুমান করতে পারা যায়।

এই পাহাড় প্রমাণ মাল মশলা চুল্লী মুখে ঢেলে দেবার ব্যবস্থাও এক যজ্ঞি বাড়ির ব্যাপার। দেশ কাল ভেদে মোটামুটি তিন রকমের ব্যবস্থা চালু আছে ঃ

এক ঃ বালতি ঢালাই (bucket charging)। এ ব্যবস্থায় চুল্লী মুখে মাল তোলার রাস্তা সোজাসুজি খাড়া। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন চুল্লীর জন্য এবংবিধ ঢালাই এক রকম অচল।

দুই ঃ খাঁচা ঢালাই (skip charging)। চুল্লী মুখে মাল তোলার ব্যবস্থা হেলান দেয়া ; আমাদের দেশে এ ব্যবস্থাই চালু।

তিন ঃ বলয় ঢালাই (belt charging)। মাল তোলার ব্যবস্থা হেলান দেয়া। এ ব্যবস্থা সর্বাধুনিক হলেও আমাদের দেশে এর প্রচলন শুরু হয়েছে বলে শোনা যায় না।

শীত পড়তে পড়তেই শুরু হয় ঘরে ঘরে পায়েসের আয়োজন। কত পরিমাণ পায়েসের জন্য কতটা দুধ, গুড়, আর চাল প্রয়োজন তার একটা মোটামুটি হিসাব গৃহিণীরা জানেন। তবে তৈরি জিনিষটি কেমন হবে তা নির্ভর করে দুধ, গুড়, চাল এবং সর্বোপরি যিনি হাতা খুন্তি নাড়বেন তার হাত যশের উপর। পরিমাণ এবং গুণমান দুটোই প্রায় কপাল ঠোকা ব্যাপার। লোহা উৎপাদনে এ অবস্থা অচল। পূর্বাহ্নেই স্থির করে নিতে হয় কোন গুণমানের লোহা উৎপাদন করতে হবে। সেই অনুযায়ী স্থির হয় খনিজ লোহা এবং বিগালক সমাহারের পরিমাপ আনুপাতিক হার অনুযায়ী।

খনিজ লোহা এবং তার বিগালক সমাহারকে বলা হয় ভার (burden)। তার মধ্যে অবশ্য কোক কয়লা অন্তর্ভুক্ত নয়।

গুণমান নামাঙ্কিত প্রতি খনিজ লোহা এবং বিগালকের ভাঁড়ার বাক্স (bin) সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে চুল্লীর সাথে হেলান দেওয়া মাল ওঠানামা করার পথের কাছে। সবার সামনে থাকে কোক কয়লার বাক্স। বিশেষ ধরনের দরজা দিয়ে (apron gate) মাল খালাসের ব্যবস্থা। ঝরে পড়ে নীচে চলাচলকারী একটা গাড়িতে। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি জিনিষের পরিমাপ হতে হবে সঠিক। তাই খোদ গাড়িটাই ওজন সংকেতদারী ব্যবস্থায় স্বয়ংসম্পূর্ণ—বলা হয় মাপক গাড়ি (scale car)। গাড়ির চালক পূর্ব নির্দিষ্ট ভাঁড়ার বাক্সের তলায় এসে বোতাম টিপে দেয়। খুলে যায় ভাঁড়ার বাক্সের বিশেষ দরজা। মাল ঝর ঝর করে পড়তে থাকে। মাপক যন্ত্রের তুলাদণ্ড সমান্তরাল হলেই ভাঁড়ার বাক্সের বিশেষ দরজা বন্ধ হয়ে যায়। এক ভার মাল পূর্ণ হলেই গাড়িটা এগিয়ে যায় হেলান দেওয়া পথের পাদদেশে। সেখানে অপেক্ষায় থাকা একটা খাঁচায় মাল ঢালা হতে থাকে প্রতি ঘণ্টায় পনের কুড়িটা খাঁচা ভরতি করতে।

কোক কয়লার ব্যবস্থা একটু আলাদা। ভাঁড়ার বাক্স থেকে কোক এসে পড়তে শুরু করে একটা কম্পমান চালনির উপর। এর সাহায্যে ধুলো এবং চুল্লীর পক্ষে ক্ষতিকর গুঁড়ো অন্য একটা পাত্রে জমা হতে থাকে। এইসব গুঁড়ো যথা সময়ে চলে যায় সিনটারিং কারখানায় প্রয়োগ উপযোগী হবার জন্য। নির্দিষ্ট পরিমাণ কোক জমা হলেই চালনিটার কম্পন থেমে যায়। সাথে সাথে খুলে যায় কোক পাত্রের তলাকার দরজা, এবং মাল ঝরে পড়ে নীচে রক্ষিত খাঁচায়।

সমগ্র প্রক্রিয়াটাই স্বয়ংক্রিয়। ধাপে ধাপে কাজ এগিয়ে যায় পূর্বনির্ধারিত

সূচী অনুযায়ী। চুল্লীর শীর্ষে থাকে দুটো অতিকায় শঙ্কু (cone) একটার উপর আর একটা। যন্ত্র থাকে পরিবণ্টক (distributor)। শঙ্কু দুটো দেখতে ঘণ্টার মত। বলা হয় চুল্লী শীর্ষ ঘণ্টা (furnace top bells)। চুল্লী-পাদদেশের কোক এবং ভারের খাঁচাগুলি ভরতি হয়ে হেলান দেওয়া পথ বেয়ে উপরে উঠে এসে নিজেদের উজাড় করে দেয় উপরের ঘণ্টা পাত্রে পরিবণ্টকের মাধ্যমে। উপরের ঘণ্টা পাত্র একটু নামিয়ে মাল ঢেলে দেওয়া হয় নীচের ঘণ্টা পাত্রে। দুবার মাল ঢালার পর নীচের ঘণ্টা পাত্র একটু নেমে যায় এবং মাল চুল্লীতে ঝরে পড়ে। এবারে উপরের পরিবণ্টকটাকে সামান্য ঘুরিয়ে দেওয়া হয় পরবর্তী মাল বোঝাই করার জন্য। কারণ দ্বিবিধ। প্রথম, একবারেই চুল্লী ভরে যায় না, দ্বিতীয়, মাল যাতে চুল্লীর চারদিকে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে, এবং পরবর্তী পর্যায়ে কোন অসুবিধার সৃষ্টি না করে। এই কর্মকাণ্ড খুব জটিল এবং ব্যস্ততাপূর্ণ। সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হয় উপরের একটা মঞ্চে অবস্থিত শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে অবস্থিত ইলেকট্রনিকস সংকেত মাধ্যমে। পরিচালনায় থাকেন একজন মাত্র লোক। এই সংকেতই তাকে বলে দিচ্ছে কর্ম কাণ্ডের বিশদ খবরা, মায় চুল্লী পেট কতটা ভরতি হল। অনেক উন্নত দেশে তো মাত্র একজন পরিচালকই একাধিক চুল্লী পরিচালনা করেন।

চুল্লীর গ্যাস সাফাই

মারুত চুল্লী থেকে বেরিয়ে আসা গ্যাস, কারখানার নানা বিভাগে এমন কি মারুত চুল্লীতেও জ্বালানির কাজ করে। তবে বেরিয়ে আসা গ্যাস প্রথমে পরিশ্রুত করে নিতে হয়। নইলে নানা ঝামেলার মোকাবিলা করতে হয়। এই পরিশোধন কর্ম যে কত জরুরী তা বুঝতে পারা যাবে ছোট একটু উদাহরণ মাধ্যমে ঃ একটা হাজার টনী চুল্লী থেকে বেরিয়ে আসা গ্যাসে প্রতিদিন প্রায় 150 টনের মত ধুলো থাকে।

প্রাথমিক পর্যায়ে গ্যাস ঊর্ধ্বমুখী নলের মাধ্যমে তড়িত বেগে প্রবাহিত করে হঠাৎ একটা ধুলোর খাঁচায় (বেশ ছড়ান) ঢুকিয়ে তার গতি পথ পালটে দেওয়া হয়। ছড়িয়ে যাবার ফলে গ্যাসের গতিবেগ কমে যায়। ফলে কিছু ধুলো পাত্রে জমা পড়ে। ঠিক যেমনটি মোহনায় এসে নদীর গতিবেগ (স্রোত ধারা) কমে আসে। কারণ, মোহনার দিকে নদীমুখ অনেক বেশি চওড়া। ফলে চড়া পড়ার প্রবণতা দেখা দেয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে গ্যাস প্রবেশ করে ঘূর্ণবাত (cyclone) যন্ত্রে। এর ভেতরে থাকে একটা গোলক। গ্যাসের গতি এই গোলকটার দেওয়ালে প্রতিহত হয়ে পালটে যায়। কিন্তু, ধূলোর একটা অংশ গোলকের দেওয়ালে আছাড় খেয়ে নীচে ঝরে পড়তে থাকে।

তৃতীয় পর্যায়ে জলের ঝরনার- সাহায্যে আরও কিছু ধূলো ধুয়ে শেষ পর্বে তাড়িত প্রক্রিয়ায় ব্যবহার যোগ্য করে তোলা হয়।

এই জমা পড়া ধূলোতেও বেশ ভাল পরিমাণ লোহা থাকে। সুতরাং, এই ধূলোও যান্ত্রিক উপায়ে ছোট ছোট ইট বা গুলে পরিবর্তিত হয়ে লোহা উৎপাদনের কাজে এসে যায়।

মারুত চুল্লী যা করে

কয়লার উনুন ধরাতে গিয়ে প্রথম স্তরে ঘুটে বা কাঠের টুকরোর উপর কয়লা ঢেলে তলা দিয়ে অগ্নি-সংযোগ করা হয়। পরে সামান্য হাওয়া করলেও ভকভক করে ধোঁয়া উপরে উঠতে থাকে। মারুত চুল্লীতেও, প্রথম উদ্বোধনের সময়, সবার নীচে কিছু কাঠ রেখে উপর থেকে একের পর এক করে কোক কয়লা, খনিজ লোহা, চুন, এবং অন্যান্য বিগালক সামগ্রী ঢালা হয়। পরের পদক্ষেপে আসার পূর্বে কোক কয়লা এবং চুনের বিশেষ ভূমিকার উল্লেখ প্রয়োজন। কোক যে দুটি কাজ করে, তা হল ঃ

১। খনিজ লোহা এবং বিগালক সামগ্রীর বিগলনের জন্য যে উত্তাপ প্রয়োজন হয় তা সৃষ্টি করা, এবং

২। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উপায়ে জারিত লোহাকে (FeO) অক্সিজেন মুক্ত করতে কার্বন সরবরাহ করা। এর ফলেই লোহা তরল হয়।

চুনের ভূমিকাও দ্বৈত ঃ

১। চুল্লীর মধ্যে যে ধাতুমল সৃষ্টি হয় তাকে এই চুন অতি মাত্রায় তরল করে এমন পর্যায়ে নিয়ে আসে যখন এর আপেক্ষিক গুরুত্ব (specific gravity) তরল লোহার তুলনায় কম হয়। ফলে ধাতুমল তরল লোহার উপরে ভাসতে থাকে, এবং

২। খনিজ লোহার মধ্যে যে সালফার থাকে তার সিংহভাগ শোষণ করে লোহার কৌলীন্য বৃদ্ধির সহায়ক হয়।

চুল্লীতে আঁচ দেবার প্রসঙ্গে ফিরে এসে বলতে হয়, বাড়িতে ব্যবহৃত উনুনের মত এতে সরাসরি অগ্নিসংযোগ করান যায় না। পরিবর্তে, চুল্লীতে বসান টুইয়ার গুলির মাধ্যমে অতি উত্তপ্ত অক্সিজেন পুষ্ট হাওয়া এবং জলীয় বাষ্প কণা চুল্লীর মধ্যে যান্ত্রিক উপায়ে ফুঁকে দেওয়া হয়। শুরু হয় তলাকার স্তরে কাঠ এবং কোকের জ্বলন প্রক্রিয়া। বাড়ির উনুনে যেমন অগ্নিসংযোগের পর ধোঁয়া উপরের দিকে উঠতে থাকে, মারুত চুল্লীতেও তার অন্যথা হয় না। অবশ্য এই অবস্থাটা হয় আমাদের চোখের আড়ালে। উত্তপ্ত গ্যাস কোক, খনিজ লোহা, এবং বিগালক সামগ্রীর বিভিন্ন স্তর ভেদ করে ঠেলে উপরের দিকে উঠতে থাকে চুল্লীর গলা পর্যন্ত। বিজারিত হয় ভার সামগ্রীর উপরিভাগের জলীয়ভাব, এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড। খনিজ লোহার পরিবর্ত রূপ জারিত লোহা— আইরণ অক্সাইড (Feo) নীচের দিকে নামতে থাকে যেটুকু কোক পুড়ল সেই পোড়া কোকের স্থান দখল করতে। কোকের জ্বলন এবং তপ্ত গ্যাসের ঊর্ধ্বগামী প্রবাহ অব্যাহত থাকে। শোষণ করতে থাকে জারিত লোহা থেকে অক্সিজেন' এবং শুরু হয় জারিত লোহার বিজারণ বিক্রিয়া (reducing reaction)। অক্সিজেন মুক্ত হয়ে লোহা গলতে শুরু করে, শোষণ করে কিছু কার্বন ; এবং ধীরে ধীরে তরল অবস্থায় এসে জমায়েত হয় চুল্লীর মেঝেতে। বাদবাকি ভার সামগ্রী ধাতুমল রূপে অতি মাত্রায় তরল হয়ে তরল লোহার উপর ভাসতে থাকে।

মনে হতে পারে মারুত চুল্লীর কর্মকাণ্ড প্রণালী কতনা সহজ সরল। বাস্তব চিত্র অনেক জটিল। বিগলনের প্রতিটি স্তরে নানা জাতের রাসায়নিক বিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। সবই ঘটে চোখের আড়ালে চুল্লীটার পেটের মধ্যে। এসব সামাল দিতেই প্রয়োজন বিশেষজ্ঞ ধাতুবিদ ইঞ্জিনিয়ারদের। এরা অধিগত বিদ্যা এবং অভিজ্ঞতার সাহায্যে উদ্ভুত পরিস্থিতির তাৎক্ষণিক মোকাবিলা করে থাকেন। না পারলে দুর্ঘটনার আশংকা থাকে প্রতি পদে পদে। উৎপাদন পর্বের পূর্বে এরাই স্থির করেন যে গুণমানের লোহা উৎপাদন করতে হবে, তার জন্য কোন সংযুতির খনিজ লোহা প্রয়োজন, সহজ এবং কম খরচে কোন বিগালক সামগ্রী ব্যবহার করতে হবে, এবং কোক কয়লার পরিমাণ, মান এবং হার কত হবে। এদের নিরলস প্রয়াস এবং সদা জাগ্রত দৃষ্টি অপরিহার্য।

বিগলিত লোহা এবং তার উপর ভাসমান তরল ধাতুমল বার করে আনতে হয় তিন-চার ঘণ্টা বাদে বাদে দুটি আলাদা নলমুখ দিয়ে।

প্রথম পালা ধাতুমলের। নির্দিষ্ট নল মুখটিকে নিরন্তর শীতল রাখতে হয় জলের ধারায়। নামে সাধারণ হলেও আচার আচরণে জীবন্ত বাঁদর। কখন কী করে বসবে তা অনুমান করা কঠিন। তাই, কারখানার পরিভাষায় ঐ নল মুখটি বাঁদর (monkey) নামেই পরিচিত। গবেষণার ফলে এর বিকল্প যদিও আবিষ্কৃত, তবে নতুন প্রকল্প ছাড়া এর পরিবর্তন খুব সহজ নয়।

ধাতুমল বেরিয়ে আসার পর আসে তরল লোহার পালা। নলমুখটি বেশ মোটা। বন্ধ থাকে বিশেষ ধরনের কাদা দিয়ে। খুলতে হয় সাত আট মিটার লম্বা লোহার শলাকা দিয়ে খুঁচিয়ে। চোখ ধাঁধানো চকচকে তরল লোহা প্রবাহিত করা হয় বিশেষ জাতের বালি দিয়ে তৈরি নালার মাধ্যমে। বালিতে সামান্য জল কণা থাকলেও তরল লোহা বেরিয়ে আসার সময় তুবড়ির মত আগুনের ফুলকি অনেক উঁচুতে উঠে বিঘ্ন সৃষ্টি করে।

দুটি ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে তরল লোহা গিয়ে পড়ে নির্দিষ্ট পাত্রে। পাত্র কেমন হবে তা নির্ভর করে এই উদ্দেশ্য ভিত্তিক। একটি হল যে তরল লোহা ফাউণ্ড্রীতে যাবে, এবং অপরটি ইস্পাত তৈরির জন্য। ফাউণ্ড্রীর জন্য হলে ছোট বড় অনেক ছাঁচ সারিবন্ধ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকে। তরল লোহার ধারা একের পর এক ছাঁচ ভরতি করতে থাকে। ছাঁচের মধ্যে তরল লোহা ক্রমে জমাট বেঁধে পিণ্ডের আকার ধারণ করে। পরে ছাঁচ মুক্ত হয়ে পিণ্ড (pig) গুলি রেল ওয়াগনে চেপে বিভিন্ন ফাউণ্ড্রীতে চলে যায়।

ইস্পাতে রূপান্তরিত হবার জন্য তরল লোহার ধারা এসে জমা হতে থাকে অতিকায় সব পাত্রে। এইসব পাত্র তৈরি হয় দুর্গল ইটে। তরল অবস্থাতেই নিয়ে যেতে হয় ইস্পাত কারখানায়। সুতরাং, শুরুতেই পাত্রগুলি বসান থাকে রেল গাড়িতে। সবটা লোহা বেরিয়ে এলে চুল্লীর নলমুখ আবার বন্ধ করে দেওয়া হয় নলমুখ বন্দুক (top hole gun) নামক যন্ত্রের সাহায্যে।

দিন নেই রাত নেই, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, চুল্লীর ভেতরটা যেন অনির্বাণ রাবণের চিতা। তিন-চার ঘণ্টা অন্তর অন্তর উগড়ে যাচ্ছে টনটন উত্তপ্ত তরল লোহা। তবে, একমাত্র কাল প্রবাহ ছাড়া, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোনকিছুই অক্ষয় অমর নয়। প্রচণ্ড উত্তাপ যার তাপাঙ্ক মাত্রা 1800°/1900° সেলসিয়াস, এবং নানা রাসায়নিক বিক্রিয়ার ঘাত প্রত্যাঘাতে চুল্লীর ভেতরটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে দশ-বার বছরের মাথায় অকেজো হয়ে পড়ে। তখন সবটুকু ধাতুমল এবং তরল লোহা বার করে দিয়ে চুল্লীটাকে নিভিয়ে ফেলা হয়।

ভেতরটা ঠাণ্ডা হবার পর আবার নতুন করে দুর্গল ইটের আস্তরণ লাগান সহ অন্যান্য মেরামতি কাজ সেরে চুল্লীকে ফের চালু করা হয়।

মারুত চুল্লীর উপজাত

উপজাত তালিকায় প্রথম স্থানে আছে চুল্লী থেকে উদগত গ্যাস যা গলা দিয়ে বেরিয়ে আকাশে মিলিয়ে যাবার উপক্রম করে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি কেমন করে এই গ্যাসকেই সাফাই করে কারখানাতে নানা বিভাগে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। দ্বিতীয় স্থানে আছে তরল ধাতুমল। প্রতি টন উৎপন্ন পিণ্ড লোহা পিছু বেরিয়ে আসে 0·6 টন মত ধাতুমল। সুতরাং, পিণ্ড লোহার উৎপাদন যেখানে চার হাজার টন, সেখানে ধাতু মলের পরিমাণ হয় 2400 টন। ফেলে দিতেও পয়সা খরচ হয়, আবার জমা করতে গেলেও গড়ে উঠবে আকাশ চুম্বী পাহাড়। তাই, নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার পর এই ধাতুমল ব্যবহৃত হয় সিমেণ্ট কারখানায় এক প্রধান উপাদান হিসেবে। এছাড়া, ড্রেনের ঢাকনা, সার, এবং কৃত্রিম তন্তুও প্রভৃতি ধাতুমল তেকে তৈরি করা সম্ভব।

মারুত চুল্লীর বিকল্প

লোহা উৎপাদনে মারুত চুল্লীর জন্য চাই উচ্চ মানের কয়লা পাহাড় প্রমাণ পরিমাণে। সবদেশে পাওয়াও যায় না। যেখানে পাওয়া যায় সেখানকার সঞ্চিত ভাণ্ডারও কিছু অফুরন্ত নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে নানা দেশে, মারুত চুল্লীর বিকল্প হিসেবে চালু আছে নানা প্রয়োগ পদ্ধতি। তাতে সাধারণ মানের কয়লা, বিদ্যুত, অপরিশোধিত তেল, লিগনাইট, প্রাকৃতিক গ্যাস জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। চাহিদার তুলনায় উৎপাদন ক্ষমতা নগণ্য। সুতরাং মারুত চুল্লী আজও একচ্ছত্র সম্রাট। তবে, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিদ্যার অগ্রগতির সাথে সংশ্লিষ্ট পণ্ডিতরা নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন যার ফলস্বরূপ দেখা পাবেন এমন এক ভৃত্যের যে খাবে কম কিন্তু কাজ করবে অনেক অনেক বেশি।

ফাউণ্ড্রী

ফাউণ্ড্রী হচ্ছে সেই কর্মশালা যেখানে বিগলিত তরল ধাতুকে ছাঁচে ঢালাই করে প্রার্থিত জিনিষ তৈরি করা হয়। অনেক যন্ত্র, যন্ত্রাংশ, ছোটখাট ব্যবহার্য বস্তু এই কর্মশালায় তৈরি হয়ে বাজারে চলে যায় ক্রেতার দাবি মেটাতে। তালিকা

ধরে দেখতে গেলে মনে হবে অনেক অনেক জিনিষ। কিন্তু, উৎপন্ন পিণ্ড লোহার সামান্য অংশই ফাউণ্ড্রীর চাহিদা মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট। সিংহভাগ চলে যায় ইস্পাত কর্মশালায়। ফাউণ্ড্রীতে ঢালাই করার জন্য চাই তরল লোহা। কিন্তু, একাধিক কারণে, মারুত চুল্লী থেকে প্রাপ্ত তরল লোহা অনেক ক্ষেত্রেই ফাউণ্ড্রীর অপছন্দ। যেসব কারণ এই না পছন্দের মূলে তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কৃত কৌশল জাতীয় কিছু অসুবিধা, প্রার্থিত বস্তুটির গুণগতমান এবং চাহিদার স্বল্পতা। সুতরাং, ফাউণ্ড্রী যে পিণ্ড লোহা কেনে তা আবার তারা গলিয়ে নেয় প্রয়োজন ভিত্তিক মানের সংযুতি অনুসারে। এটা করা হয় পিণ্ড লোহা এবং বর্জ্য পিণ্ড মিশিয়ে, বলা হয় মিশাল (mixture)।

লোহা গলান হয় কিউপলা (cupola) নামক যন্ত্রে। এই যন্ত্রটি আসলে মারুত চুল্লীর মিনি (mini) সংস্করণ। তাড়িত বা অন্য পদ্ধতিতেও গলাবার কাজ সম্পন্ন হয়।

খনিজ লোহা থেকে উৎপন্ন পিণ্ড সব সময় উচ্চ মানের শক্তিধর হয় না। ফলে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ফাউণ্ড্রীতে গলান লোহাকে আবার তাড়িত চুল্লীতে পরিশ্রুত করে মান এবং শক্তির উন্নতি করে নিতে হয়। রাস্তা থেকে তুলে আনা কুকুর ছানাটাকে একটু যত্ন আত্তি করে মানুষ করে তোলার মত।

সাধারণতঃ, বালি দিয়ে তৈরি ছাঁচেই ঢালাই-এর কাজ হয়। কিন্তু, উন্নত মানের জিনিষ তৈরি করতে যে ছাঁচ ব্যবহৃত হয় তা বানাতে হয় বালির সাথে আঠা জাতীয় বস্তু, বিঁটোনাইট, কাদা কিংবা বিশেষ ধরনের জৈব পদার্থ সংমিশ্রণে। এই কর্মটি সম্পন্ন হয় যান্ত্রিক উপায়ে।

ছাঁচ তৈরির প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে কাঙ্ক্ষিত বস্তুটির একটি সঠিক নমুনা বানান। এই নমুনা কাঠ, ধাতু, কিংবা প্লাস্টিক থেকে হয়ে থাকে। তৈরি হয়ে গেলে নমুনাটি রাখা হয় একটি বাক্সে। এবার বালি বা এজাতীয় মিশ্র পদার্থ বাক্সটার মধ্যে ঢালা হয়। ঝাঁকুনি, দুরমুশ, চিপরান প্রভৃতি নানা প্রক্রিয়ায় বালি বা তার মিশ্রিত বস্তু নমুনাটির চারদিকে জমিয়ে দিতে হয়। এবার নমুনাটিকে খুব সাবধানে বাক্স থেকে বার করে আনার পালা। বাক্সের মধ্যে যে শূন্যস্থান সৃষ্টি হল তা ঐ কাঙ্ক্ষিত বস্তুর আকার হয়ে গেল। কাজের সুবিধার জন্য এক একটা ছাঁচ দুই কিংবা তিন ভাগেও বানাতে হয়।

তরল লোহা এই শূন্যস্থানে ঢেলে দরকারী বস্তুটি তৈরি করা হয়।

এমন অনেক পণ্য আছে যার মধ্যে এক বা একাধিক ফাঁক-ফোকর থাকে।

তেমন তেমন ক্ষেত্রে, বালি বা অন্য কিছুর সাহায্যে সেই আকারের মূল (cores) বানিয়ে ছাঁচের মধ্যে তার আপন স্থানে বসিয়ে ঢালাই কাজ সম্পন্ন হয়। আবার' অনেক পণ্য আছে যা আকারে প্রকারে বেশ জটিল। সুতরাং, ছাঁচ তৈরির বিভিন্ন স্তরের কাজের জন্য চাই দক্ষ প্রযুক্তিবিদ এবং কর্মী। সামান্য ভুলচুকের ফলে পুরো ঢালাই-এর কাজটাই বরবাদ হয়ে যেতে পারে। যেসব ফাউন্ড্রীতে খুব বেশি সংখ্যায় ছাঁচ প্রয়োজন হয়, যেসব ফাউন্ড্রীতে অনেক ক্ষেত্রে ছাঁচ তৈরি এবং ঢালাই-এর কাজ যান্ত্রিক উপায়ে করা হয়। ফলে, সময়, খরচ এবং ভুলচুক অনেকাংশে কমে যায়।

ভারী এবং বৃহদাকার পণ্যের জন্য তরল লোহা ভরতি বিশালকায় সব পাত্র (laddle) ব্যবহৃত হয়। কিউপলা থেকে ঢেলে এইসব পাত্র ভরতি করে ক্রেনের সাহায্যে ছাঁচ মুখে এনে ছাঁচগুলি ভরতি করা হয়।

জমাট বাঁধার পর ঢালাই করা বস্তুটি ছাঁচের মধ্য থেকে বার করে আনা হয়। ব্যবহৃত ছাঁচটিকে অবশ্য আবার নতুন করে বানিয়ে নিতে হয়।

ঢালাই হবার পর বস্তুটির দেহে অনেক বাড়তি মাল লেগে থাকে। করাত, বাটালি, তারের ব্রাস, বিচূর্ণকারী যন্ত্র, বালির ঝাপটা বা ব্যারেলের সাহায্যে দেহে লেগে থাকা বাড়তি মাল সাফাই করে নিতে হয়। এই ব্যারেল সাফাই একটু বিশেষ উল্লেখের দাবিদার। ঢালাই করা বস্তুটি এই ব্যারেলের মধ্যে পুরে ব্যারেলটাকে গড়িয়ে গড়িয়ে ঘসটানোর ফলে বাড়তি মাল পরিষ্কার হয়। কারখানার ভাষায় বলা হয় ফেটলিং (Fettling)। বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে এইসব কাজ বেশ শ্রমসাধ্য। তাছাড়া, সিলিকসিস নামক রোগও কর্মীদের আক্রমণ করতে পারে। ফলে দক্ষ কর্মী পাওয়া একটা সমস্যা হয় অনেক সময়। তাই, দিন কে দিন যন্ত্র দানবকেই এবংবিধ কাজে লাগানোর প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সাফ সাফাই হবার পর পণ্য বস্তুটি হয় অন্য কোন বস্তুর সাথে যুক্ত হবার জন্য দ্বিতীয় যন্ত্র ঘরে চলে যায়, নয়তো সোজাসুজি বাজারে ক্রেতার চাহিদা মেটাতে।

ঢালাই বস্তুটিকে মরচে ধরার প্রবণতা থেকে বাঁচাবার জন্য রং, এ্যানামেল, বা ধাতব আস্তরণ ব্যবহার করা হয়। অনেক সময় শুধুমাত্র অলংকরণের জন্যই এইসব ব্যবস্থা করতে দেখা যায়।

স্পঞ্জ লোহা

স্পঞ্জ কথা শুনলেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে তুলতুলে স্পঞ্জ রসগোল্লার ছবি। আমাদের রসনা সিক্ত হয়। আবার স্পঞ্জ নামে এক ধরনের জলচর প্রাণী আছে, যার জীবনাবসান ঘটলে তা ব্যবহৃত হয় বাথরুমে সাবান ঘষার কাজে, কিংবা অফিস কাছারিতে ডাক টিকিট সাঁটাতে। তাও তুলতুলে। কিন্তু যে পদার্থ স্পঞ্জ লোহা নামে পরিচিত তা বহুরন্ধ্র যুক্ত হলেও মোটেই তুলতুলে নয়। বেদম শক্ত। কারণ, আসলে তা লোহাই।

তবু কেন এই নামকরণ হল তার কোন লিখিত কৈফিয়ত জানা নেই। তবে অনুমানে যা মনে হয় তা হলঃ খনিজ লোহা জারিত হতে হতে যে তাপাঙ্কে উত্তপ্ত তরল লোহায় রূপান্তরিত হয় ঠিক সেই তাপাঙ্কের পূর্ববর্তী অবস্থায় লোহা বহুরন্ধ্রযুক্ত তুলতুলে অবস্থা প্রাপ্ত হয়। রন্ধ্রগুলি সৃষ্টি হয় খনিজ লোহার অক্সিজেন অপসারণের ফলে। স্পঞ্জের সাথে এর সাদৃশ্য দেখে বোধহয় এই শিল্পের কর্মীরা একে স্পঞ্জ লোহা বলে চিহ্নিত করে থাকবে। এটা একান্তই একটা আটপৌরে নাম। আসল তকনিকি নাম (technological name) হচ্ছে সরল বিজারিত লোহা (direct reduced iron)। উৎপন্ন স্পঞ্জ লোহার কম বেশি 90 শতাংশ লোহা এবং বাকিটা ধাতুমল।

এর ব্যবহার প্রধানতঃ মারুত চুল্লীতে, তাড়িত চাপ চুল্লীতে, বা খোলা মেঝে চুল্লীতে পিণ্ড লোহা বা ইস্পাত উৎপাদনে বর্জ্যের (scrap) পরিবর্তে।

ফাউন্ড্রীতে স্পঞ্জ লোহার প্রয়োগ প্রায় অনুপযুক্ত বললেই হয়, যদিও হালফিলে এর প্রয়োগজাত কৃত-কৌশল ধীরে ধীরে ফাউণ্ড্রীর কাজেও অনুপ্রবেশ করতে শুরু করেছে।

পিণ্ড লোহা উৎপাদনের প্রচলিত প্রথা পদ্ধতিতে স্পঞ্জ লোহা উৎপন্ন করা যায় না। ভাটির আকার প্রকার এবং বিজারক মাল সামগ্রীও অনেকাংশে ভিন্নতর। জ্বালানি হিসেবে সাধারণ মানের অ-কোক (non-coaking) কয়লা, গ্যাস বা তেলের সাহায্যে খনিজ লোহাকে স্পঞ্জ লোহায় রূপান্তরিত করা সম্ভব। কয়লা ভিত্তিক স্পঞ্জ লোহা উৎপন্ন হয় ঘূর্ণ ভাটি (rotary kiln)-তে। এই ভাটি অনুভূমিক যদিও কাঁচা মাল ঢালাই-এর দিকটা ঈষৎ উঁচু। কিন্তু গ্যাস বা তেল ভিত্তিক স্পঞ্জ লোহা উৎপন্ন হয় খাড়া (shaft kiln) ভাটিতে। ঘূর্ণ ভাটিই হোক বা খাড়া ভাটিই হোক, প্রতি ভাটি পিছু উৎপাদন হার খুব বেশি হয় না।

তুলনার হাত ধরে একটু পরিমাণ গত পার্থক্য বুঝতে চেষ্টা করা যাক ঃ মারুত চুল্লীতে উৎপন্ন পিণ্ড লোহার হার যদি একটা বড় মাপের পুকুর বলে ধরে নেয়া যায়, তবে ভাটি পিছু স্পঞ্জ লোহার হার হবে একটা ছোট চৌবাচ্চা।

বর্তমানে স্পঞ্জ লোহা উৎপাদন ব্যয়, প্রচলিত পিণ্ড লোহা উৎপাদন ব্যয়ের চাইতে তুলনায় বেশি। তাছাড়া, পিণ্ড লোহার মত এর যথেচ্ছ প্রয়োগও সম্ভব নয়। তবু কিন্তু স্পঞ্জ লোহার জনপ্রিয়তা এবং উৎপাদন হার দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। এক সমীক্ষায় জানা যায় যে ১৯৮১ সনে সারা দুনিয়ায় যত ইস্পাত উৎপন্ন হয়েছে তার ২১ শতাংশ মত কাঁচা মাল হচ্ছে বর্জ্য এবং স্পঞ্জ লোহা। এক অর্থে স্পঞ্জ লোহা আজ অপরিহার্য। এই ক্রমবর্দ্ধমান জনপ্রিয়তার কারণ খোঁজ করতে গিয়ে যে ছবিটা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় তা হল ঃ

১। পিণ্ড লোহা এবং ইস্পাত উৎপাদনে বর্জ্য লোহা এবং বর্জ্য ইস্পাত কাঁচা মাল হিসেবে (অবশ্যই আংশিক) প্রয়োজন হয়। এটা আমরা সকলেই জানি যে কালের গতির সাথে সাথে লোহা এবং ইস্পাতের চাহিদা এবং উৎপাদন হারও বাড়তির দিকে। সুতরাং, তার সাথে তাল রাখতে বর্জ্য লোহা এবং বর্জ্য ইস্পাতও বেশি পরিমাণে প্রয়োজন। কিন্তু, এই বাড়তি পরিমাণ কোথা থেকে আসবে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে দুটি বিপরীতমুখী ধারার মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটা সন্তোষজনক পথ বেছে নিতেই হয়। এক দিকে ঃ লোহা এবং ইস্পাত উৎপাদনে দিনের শেষে কিছু না কিছু পরিমাণ অকেজো/বর্জ্য লোহা বা ইস্পাত পড়ে থাকবেই থাকবে। তার পরিমাণও যে সব সময় হেলা ফেলার তাও নয়। সুতরাং, সদাই চেষ্টা থাকে কৃত-কৌশল এবং তকনিকি উন্নতি ঘটিয়ে এই বর্জ্যের হার সমূলে উৎপাটিত করা বা ন্যূনতম করা। অন্যদিকে ঃ লোহা এবং ইস্পাতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে উৎপাদনের হারও বৃদ্ধি পেতে বাধ্য। যেহেতু বর্জ্য এক্ষেত্রে অন্যতম কাঁচা মাল, সেহেতু, এর চাহিদাও ক্রমবর্ধমান। এই দুই বিপরীত ধারার প্রভাবে যে শূন্যতা সৃষ্টি হবার কথা তা পূর্ণ করতে পারে স্পঞ্জ লোহা। কিন্তু চাহিদার তুলনায় উৎপাদনের পরিমাণ নগণ্য বললেই চলে। বাধ্য হয়ে ভারতের মত অনেক উন্নতিকামী দেশ বর্জ্য লোহা এবং বর্জ্য ইস্পাত আমদানি করে থাকে। এতে যে শুধু পর নির্ভরতাই বৃদ্ধি পায় তা নয়, জরুরী অবস্থায় রপ্তানি কারক দেশ নানা বেকায়দায় ফেলতে পারে আমদানি কারক দেশকে। পূর্ববঙ্গে অধুনা বাংলাদেশে একটা চলতি কথা আছে ঃ পর হস্তে ধন আর পরের নায় গমন। আমি যতই ভাল করতে

চাই না কেন, অর্থের জন্য যদি আমাকে অপরের মর্জির ওপর নির্ভর করতে হয়, তবে আমার সব সদিচ্ছা আকাশ কুসুমে পর্যবসিত হতে বাধ্য। যেখানে বর্ষায় নৌকোই একমাত্র পরিবহন ব্যবস্থা সেখানে পরের উপর ভরসা করে থাকা মানে ফাঁকি। তাছাড়া, প্রয়োজনের সবটাই কি আমদানি করা সম্ভব ? না, তাও সম্ভব নয়। ফলে আমাদের দেশে যে সমস্ত ক্ষুদ্র (MINI) ইস্পাত কারখানা আছে তারা সাধ্য থাকলেও সাধ পূর্ণ করতে পারে না। অর্থাৎ, উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ সদ্‌ব্যবহার হয় না।

২। প্রচলিত পদ্ধতিতে পিণ্ড লোহা উৎপাদনের জন্য চাই উচ্চমানের কোক কয়লা। কিন্তু স্পঞ্জ লোহা উৎপাদনে সাধারণ মানের অ-কোক কয়লাও ব্যবহার করা যায়। আমাদের দেশে কয়লার ভাণ্ডার আশাপ্রদ। তবে এই কয়লার মাত্র 23 শতাংশ উচ্চ মানের। ক্রমবর্দ্ধমান পিণ্ড লোহার চাহিদার কথা মনে রেখে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন বর্তমান হারে খরচ হতে থাকলে এই উচ্চমানের কয়লা ভাণ্ডার আগামী 60 থেকে 70 বছরের মধ্যে নিঃশেষিত হয়ে যাবে। তুলনায় অ-কোক কয়লার চিত্র উৎসাহজনক। যেহেতু অ-কোক কয়লার সাহায্যে স্পঞ্জ লোহা উৎপাদন করা সম্ভব, সেহেতু কোক কয়লার খরচের হার কমিয়ে এবং স্পঞ্জ লোহার উৎপাদন হার বৃদ্ধি করে পিণ্ড লোহা উৎপাদন হার বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

৩। প্রাকৃতিক গ্যাস বা অ-কোক কয়লাকে গ্যাসে রূপান্তরিত করেও স্পঞ্জ লোহা উৎপাদন করা যেতে পারে।

৪। স্পঞ্জ লোহার সাহায্যে তাড়িত চাপ চুল্লী মারফত ক্ষুদ্র সম্পূরিত ইস্পাত কারখানা স্থাপন করা সম্ভব। অর্থনৈতিক দিক থেকে এইসব কারখানা সমমাপের প্রচলিত সম্পূরিত ইস্পাত কাখানার সাথে তুল্য। কিন্তু প্রচলিত তিন চার মিলিয়নটনী (বাৎসরিক) সম্পূরিত ইস্পাত কারখানার (যেমন ঃ রাউরকেল্লা দুর্গাপুর ইত্যাদি) তুলনায় কমবেশি পনের শতাংশের মত অধিক। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে বৃহদাকার ইস্পাত প্রকল্পগুলি অতিমাত্রিক মূলধন নির্ভরশীল যা আমাদের মত উন্নতকামী দেশ সব সময় বহন করে উঠতে পারে না। তুলনায় তাড়িত চাপ চুল্লী ভিত্তিক প্রকল্প অপেক্ষাকৃত কম খরচে প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং উৎপাদন ক্ষমতাও ধাপে ধাপে বৃদ্ধি করা সম্ভব। প্রকল্প ছোট হওয়ার ফলে স্থানীয় চাহিদা ভিত্তিক কারখানা স্থাপন করা তেমন অসুবিধার ব্যাপার নয়। এইসব প্রকল্পে পরিবেশ দূষণের সম্ভাবনাও অপেক্ষাকৃত কম।

৫। এটা অবশ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন যে তাড়িত চাপ চুল্লীর জন্য চাই সুনিশ্চিত নিয়ন্ত্রিত অতিমাত্রায় বিদ্যুৎ সরবরাহ। উৎপাদন এবং সরবরাহ ব্যয় অত্যধিক হলে ক্ষুদ্র সম্পূরিত কারখানা স্থাপনের পথে প্রবল বাধা সৃষ্টি হতে বাধ্য। অবশ্য অত্যাবশ্যক ক্ষেত্রে কারখানা তার নিজস্ব চত্বরেই একান্ত নিজস্ব মালিকানায় শক্তি কেন্দ্র (captive power plant) গড়ে তুলতে পারে। কোন কোন কারখানা তা করছেও। তবে জাতীয় স্তরে যে সমস্ত তাপবিদ্যুৎ, জল বিদ্যুৎ এবং আণবিক প্রকল্প আছে, সেখান থেকে উচ্চ চাপের (high voltage) সাহায্যে বিদ্যুৎ দূর দূরান্তে সরবরাহ করে ক্ষুদ্র কারখানা চালু রাখা অসম্ভব নয়।

এই চিত্র সামনে রেখেই ভারত সরকার ইতমধ্যেই আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বাৎসরিক 5,43,000 টন স্পঞ্জ লোহা উৎপাদন ক্ষমতার লাইসেন্স প্রদান করেছেন। এর মধ্যে কম বেশি 33,000 টন উৎপাদন ক্ষমতা যুক্ত কয়েকটি প্রকল্প ইতমধ্যেই স্থাপিত হয়ে গেছে। উদ্যোগ অব্যাহত।

বেসরকারি ক্ষেত্রে টাটা কোম্পানি তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে সামান্য হলেও স্পঞ্জ লোহা উৎপাদন শুরু করেছে।

নিঃসন্দেহে বলা চলে যে স্পঞ্জ লোহার উৎপাদন মানচিত্রে আজ ভারত তার আপন স্থান পাকাপাকি ভাবে চিহ্নিত করতে বদ্ধপরিকর। আত্মনির্ভরতার পথে এটা দৃঢ় পদক্ষেপ।

ইস্পাত উৎপাদন

খনিজ লোহার যেভাবেই রূপান্তর ঘটানো যাক না কেন, তাতে আংশিকভাবে কার্বন, সিলিকন, ম্যাঙ্গানিজ, ফসফরাস এবং সালফার থেকেই যায়। ফলে অনেক ভোগ্য পণ্যই আবর্তন (rolling) বা নিস্পেষণ (forging) করে উৎপাদন করা যায় না। সুতরাং, হয় এসব একেবারে দূর করা, নয়তো এদের আনুপাতিক হার এমনভাবে কমিয়ে আনা যাতে পিণ্ড বা দ্রবীভুত লোহা নমনীয় হয়। কিন্তু, এইসব অনাহূতেরা তো লোহার সাথে। আলগা হয়ে মিশে থাকে না যে শুধু মাত্র ঝাড়াই বাছাই করে সমস্যার হাল করা যাবে। তাই প্রশ্ন ঃ বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে। এই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে ইঁদুররা দিশেহারা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু, ধাতুবিদরা ভেবে চিন্তে হাওয়ায় মিশে থাকা অক্সিজেনকেই এ কাজের যোগ্য বলে বুঝতে পারল।

আমরা সবাই দেখেছি লোহাকে বাইরে ফেলে রাখলে তাতে মরচে ধরে যায়।

যে বিক্রিয়ার ফলে এমনটি ঘটে তা হল ঃ আবহাওয়ার অক্সিজেন যুক্ত জলীয় ভাব এবং তাপ লোহার উপরিভাগে যে দহন (combustion) প্রক্রিয়া সৃষ্টি করে তাতেই লোহা জারিত (oxidized) হয়ে মরচের জন্ম দেয়। এই সূত্র ধরেই ধাতুবিদরা পিণ্ড লোহা পরিশ্রুত করে বিভিন্ন জাতের ইস্পাত আমাদের হাতে পেঁছে দেয়।

যেসব প্রথা পদ্ধতিতে এই জারণ বিক্রিয়াকে কাজে লাগান হয় তার মধ্যে প্রধান হল ঃ

1. ক্ষারকীয় বেসিমার পদ্ধতি,
2. এ্যাসিড বেসিমার পদ্ধতি,
3. এল ডি পদ্ধতি এবং
4. তাড়িত পদ্ধতি।

পদ্ধতিগত এই প্রভেদ নানা কারণে ঘটে থাকে।

প্রথমেই দেখুন না, এ্যাসিড বেসিমার পদ্ধতি পিণ্ড লোহা থেকে ফসফরাসকে বার করে দিতে প্রায় অক্ষম। ফলে, যে সমস্ত পিণ্ড লোহায় ফসফরাসের হার বেশি তাদেরকে ইস্পাতে রূপান্তরিত করতে ক্ষারকীয় বেসিমার পদ্ধতির দ্বারস্থ হতে হয়। আবার ক্ষারকীয় পদ্ধতিতে উৎপন্ন ইস্পাতের প্রয়োগ মান ব্যাপক হলেও ত্রুটিমুক্ত নয়। নাইট্রোজেন এবং ছিটেফোঁটা সালফার থেকেই যায়। ফলে ঝালাই কাজে এ জাতের ইস্পাত অনেক ক্ষেত্রে অচল। আর বর্তমানে ইস্পাত শিল্পে ঝালাই-এর প্রয়োগ ব্যাপক। এদিক থেকে এল ডি পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী। এই পদ্ধতিতে ইস্পাত উৎপন্ন হয় পরিশ্রুত অক্সিজেনের সাহায্যে। অর্থাৎ হাওয়া মিশ্রিত অক্সিজেনের বদলে। ফলে, এল ডি পদ্ধতি বিশেষ জনপ্রিয় এবং নতুন নতুন ইস্পাত প্রকল্পে এই পদ্ধতিই চালু করার প্রবণতা দেখা যায়। তাড়িত পদ্ধতিতে বিগলন খুব দ্রুত গতিতে ঘটে। উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে মানগত নিয়ন্ত্রণও অপেক্ষাকৃত সহজ। ফলে, খুব উচ্চমানের ইস্পাত উৎপাদনে তাড়িত পদ্ধতি আদর্শ বলে বিবেচিত।

এতো গেল পদ্ধতিগত সাধারণ দোষগুণের আলোচনা। এবারে আসা যাক এদের পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বিবরণে।

ক্ষারকীয় বেসিমার পদ্ধতি

উৎপন্ন লোহা তরল অবস্থাতেই ইস্পাত কর্মশালায় নিয়ে আসা বাঞ্ছনীয়। ফলে, মারুত চুল্লী এবং ইস্পাত কর্মশালার মধ্যে সম্পর্ক অতি নিবিড়। তবে,

যত নিবিড়ই হোক না কেন, এ দু'য়ের মাঝে কিছু দূরত্ব তো থাকবেই। তাই, তরল লোহা ইস্পাত কর্মশালায় পরিবহণের জন্য বিশেষ ধরনের টর্পেডো আকারের বিপুল দেহী পাত্র ব্যবহৃত হয়। মাল বোঝাই এবং খালাসের জন্য কেবল মাত্র নলমুখযুক্ত ঢাকনা ছাড়া এই পাত্রের চারদিক মজবুত আবরণে আবৃত।

ইস্পাত কর্মশালায় থাকে হাজার দেড়েক টন মাল ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন অতিকায় ভাণ্ড (mixer)। দেখতে বেলনের মত। তরল লোহা ভরতি টর্পেডো-গুলি ক্রেনের সাহায্যে এসে ঐ ভাণ্ডে জমা হতে থাকে। এই ভাণ্ডের প্রয়োজন বিশেষ দুটি কারণে। এক, চুল্লী থেকে আনিত—দফায় দফায়, লোহার মান ভিন্ন ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। এই ভাণ্ডে এসে সব মানের তরল লোহায় এক রকম সমীকরণ ঘটায়। দুই, কর্মশালার চাহিদা এবং চুল্লী থেকে মাল যোগানে বৈষম্য এড়ান। সঞ্চিত ভাণ্ডের লোহা যাতে তরল অবস্থাতেই থাকে তার জন্য কোক ওভেন বা চুল্লী থেকে প্রাপ্ত গ্যাসকে জ্বালানিরূপে ব্যবহার করা হয়।

যে পাত্রের সাহায্যে ইস্পাত উৎপন্ন হয় তাকে বলা হয় পরিবর্তক(converter)। এর ভেতরের গা এবং তলা ভস্মীভুত ডলোমাইট ইটে তৈরি। কোন কোন পরিবর্তকের তলা অসংখ্য ছিদ্র যুক্ত।

তরল লোহা এবং পরিমিত চুর্ণিত চুন পরিবর্তকে প্রথমে ঢালা হয়। পরে অক্সিজেন সমৃদ্ধ হাওয়া নলমুখ সাহায্যে তলা দিয়ে প্রবাহিত করা হয়। প্রায় সাথে সাথেই ঘটে এক উদ্দীপক দৃশ্যের অবতারণা। হাওয়া সিংহ গর্জনে ঝড়ের বেগে পরিবর্তকের মধ্য দিয়ে ছুটতে ছুটতে নালি মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। যাকে বলে কানে তালা লাগার মত। জ্বলন্ত লৌহ কণা এবং ধাতুমলের স্ফুলিঙ্গ আকাশের বুকে উল্কার পরিবেশ সৃষ্টি করে। এভাবেই জারণ বিক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটে। প্রথমেই জারিত হয় সিলিকন এবং ম্যাঙ্গানিজ। পরে কার্বন এবং ফসফরাস। প্রায় পনের মিনিট ধরে এই বিক্রিয়া চলার পর হাওয়া প্রবাহের চাবি বন্ধ করে দেয়া হয়। বলা যায় ইস্পাত উৎপাদনের পালা শেষ হল। কিছু পরিমাণ ধাতুমল তরল ইস্পাতের উপর ভাসতে থাকে যা আলাদা পাত্রে ঢালা হয়।

একই সংযুতির ইস্পাত সব রকম প্রয়োগ এবং কাজের উপযুক্ত হয় না। তাই চাহিদা অনুযায়ী তরল ইস্পাতের সাথে মিশ্রিত করা হয় ম্যাঙ্গানিজ এবং কার্বন সমৃদ্ধ মিশ্র লোহা যা পূর্বাহ্নেই বিশেষ কোন চুল্লীতে তরল করে বা গনগনে অবস্থায় রাখা থাকে। কখন কখন এর সাথে মিশ্রিত করা হয় বর্জ্য ইস্পাত এবং

বিগালক। আবার খানিক সময় ধরে চলে হাওয়া প্রবাহ পরিবর্তকের মধ্য দিয়ে। এই মেলানো মেশানোর হার এবং পর্যায় ক্রম নির্ভর করে ইস্পাতের সংযুতির উপর। এই কাজ সুষ্ঠু রূপে সম্পন্ন করতে প্রতি পরিবর্তকের সাথে থাকে একটি নিয়ন্ত্রণ মঞ্চ। ঐ মঞ্চে দাঁড়িয়ে একজন পরিচালক চাবি এবং চাকা ঘুরিয়ে কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন পর্ব সমাধান করে।

তরল ইস্পাতের উপর ভাসমান ধাতুমল আলাদা করার পর পরিবর্তকের তরল ইস্পাত ঢালা হয় ট্রাকে অপেক্ষারত একটা বিপুল দেহী পাত্রে (ladle)।

আরও একটি প্রক্রিয়ার কথা অবশ্যই উল্লেখ্য। পরিবর্তকের মধ্যে হাওয়া প্রবাহ বন্ধ করলেই কিন্তু তার মধ্যেকার জারণ বিক্রিয়ার ইতি ঘটে না। চলতে থাকে ছাঁচে ঢালাই করার পরেও। যতক্ষণ না তরল ইস্পাত নিরেট পিণ্ডে পরিণত হয়। কারণ, পরিবর্তকের মধ্যে হাওয়া প্রবাহের ফলে যে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন ছাড়া পায় তা কার্বনের সাথে মিশে কার্বন মনক্সাইড রূপে উপরের দিকে উঠতে থাকে। দেখা যায় তরল ইস্পাত টগবগ করে ফুটছে। ফলে শক্ত পিণ্ডের ভেতরের সংযুতিতে সমতা থাকে না। এ অবস্থা ক্ষেত্র বিশেষে লাভদায়ক, আবার ভিন্ন প্রয়োগক্ষেত্রে ক্ষতিকর। সুতরাং, যখন উচ্চমানের সম সংযুতি-সম্পন্ন ইস্পাতের প্রয়োজন হয় তখন পরিবর্তক থেকে ঢালার সময় এই বিক্রিয়ার ইতি ঘটান হয় যাকে কারখানার ভাষায় বলা হয় নিহত করা (killed)। পাত্রের মধ্যেকার টগবগি ভাবটাকে জীবনের সাথে তুলনা করেই বোধ হয় এই ইতি ঘটানোকে নিহত করা বলা হয়। এই নিধন কর্মের প্রধান অস্ত্র সিলিকন বা এ্যালুমিনিয়ামের মিশ্রণ। মহাদেবের মত তাদেরও সেই তাৎক্ষণিক ক্ষমতা আছে যা দ্বারা অক্সিজেনকে নিজেদের মধ্যে টেনে নিবীজ করে দিতে পারে।

তরল ইস্পাতকে নিরেট পিণ্ডে জমাট বাঁধাতে হয় যাতে পিণ্ডগুলি আবর্তন কর্মশালায় (rolling mills) গিয়ে নানাবিধ ভোগ্যপণ্যে রূপান্তরিত হতে পারে।

তরল ইস্পাত জমাট বাঁধাবার জন্য প্রয়োজন হয় ঢালাই লোহায় তৈরি ছাঁচ (ingot mould)। ওগুলি দেখতে মঠের মত। তলা থেকে উপরের দিকে ওঠা ছুঁচলো আকারের। একেবারে উপরের দিকে বিপরীত দুই ভুজে বেরিয়ে থাকে দুটো কোঁৎকা মত দণ্ডাংশ। ছাঁচগুলি বসান থাকে বিশেষ ধরনের ইস্পাতে তৈরি পাতের উপর। একে বলা হয় স্টুল। আবর্তন কর্মশালার চাহিদা অনুযায়ী ছাঁচগুলি নানা আকারের হয়। যেমন—গোল, বর্গাকার ইত্যাদি। ছাঁচগুলি একপ্রকার বিশেষ ধরনের নালায় সারবন্দী অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকে। তরল

ইস্পাতের পাত্র ক্রেনে চেপে সামনের দিকে এগিয়ে চলে একের পর এক ছাঁচ ভর্তি করতে করতে। সবটাই হয় যান্ত্রিক উপায়ে।

ঢালাই হয় দু'রকম পদ্ধতিতে। একটি হল ছাঁচের উপর থেকে ঢালা। বলা হয় উৎরাই ঢালাই (down hill)। দ্বিতীয়টি হল চড়াই ঢালাই (up hill)। এ কর্মসম্পন্ন হয় ছাঁচের তলা থেকে নলের সাহায্যে। এই পদ্ধতিতে একটু বেশি সময় লাগে। কিন্তু পিণ্ডের গা বেশ মসৃণ থাকে। জমাট বাঁধার পর, ক্রেন চালিত একটা বিমুক্তকারী যন্ত্রের মাড়ী এসে কামড়ে ধরে ছাঁচের উপরের অংশের দণ্ডাংশ দুটিকে। যান্ত্রিক উপায়ে স্টুলটিকে চেপে রেখে বিমুক্তকারী যন্ত্র অসুর শক্তি প্রয়োগ করে ছাঁচ বিছিন্ন করে উপরের দিকে তুলে নেয়। পিণ্ড কিন্তু তখনও গনগনে লাল অবস্থায় থাকে। এই অবস্থাতেই পিণ্ড কর্মশালায় যায়।

নানা প্রকার সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও কিছু না কিছু গ্যাসের অস্তিত্ব পিণ্ডের মধ্যে থেকেই যায়। বিশেষ করে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন। অবশ্য সাধারণ মানের ভোগ্যপণ্য এই মানের ইস্পাত থেকেই তৈরি হয়ে থাকে। কিন্তু, যেসব পণ্য ভারী কাজে ব্যবহৃত এবং যা অতিকায় হাতুড়ির ঘা মেরে তৈরি হয়, কিংবা যার জন্য চাই উচ্চ মানের ঢালাই ইস্পাত, সেসব ক্ষেত্রে এই সাধারণ মানের ইস্পাত ক্ষতিকর। এই সমস্যার মোকাবিলা করা হয় নিবাত (vacuum) ঢালাই পদ্ধতির সাহায্যে। এই পদ্ধতিতে তরল ইস্পাত ঢালাই করা হয় একটি বিশেষ নিবাত পাত্রে। এই পাত্রের মধ্যে বসিয়েই ঢালাই কাজ চলতে থাকে। যখন এই ঢালাই কর্ম অবিরাম গতিতে চালিয়ে যেতে হয়, তখন পুরো পাত্রটাই ভিন্ন আর একটা নিবাত পাত্রে ঢোকান থাকে। নিবাত পাত্রে ঢালা মাত্রই তরল ইস্পাত অসংখ্য ফোঁটায় ছিন্ন বিছিন্ন হয়ে যায়। ফোঁটাগুলি ক্রমে বেলুনের মত ফুলতে ফুলতে ফেটে গিয়ে প্রায় গ্যাস মুক্ত হয়ে যায়। অতি উন্নত মানের ইস্পাত উৎপাদনে এই পদ্ধতি খুবই উপযোগী সন্দেহ নেই। কিন্তু, প্রচণ্ড উত্তাপ, অতিকায় নিবাত পাত্র, ছাঁচ নিবাতিকরণ ব্যবস্থা, এবং নিয়ন্ত্রণ, খুবই জটিল এবং এলাহী। ফলে এই পদ্ধতি বহু প্রচলিত না হলেও আমাদের দেশে দুর্গাপুর এবং রাউরকেল্লায় চালু আছে।

অবিরাম ঢালাই

সাধারণতঃ, এক একটি ইস্পাত পিণ্ডের ওজন ছ' থেকে সাত টনের মত হয়। ব্যবহারযোগ্য করে তোলার পূর্বে এইসব পিণ্ড আবর্তন কর্মশালায় আবর্তক

যন্ত্রে পিষ্ট হয়। আকার এবং আয়তন বেড়ে যায়। রূপান্তরিত হয় ব্লুম (bloom) এবং বিলেটে (billet)। যে কর্মশালায় তপ্ত আবর্তন (hot rolling) পদ্ধতি চালু সেখানে পিণ্ডটিকে সঠিক তাপাঙ্ক মাত্রায় ধরে রাখবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়।

এই পদ্ধতি ব্যয় এবং সময় সাপেক্ষ। ফলে, অনেক ক্ষেত্রে অবিরাম ঢালাই পদ্ধতি চালু করে সোজাসুজি ছ' থেকে আট আকারের এবং আয়তনের ব্লুম বা বিলেট তৈরির কাজ অনেক উন্নত দেশের মত আমাদের দেশেও সরকারি বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই সমান জনপ্রিয়।

এ্যাসিড বেসিমার পদ্ধতি

ক্ষারকীয় বেসিমার পদ্ধতির সাথে তারতম্য সামান্যই। প্রথমত, পরিবর্তকের মধ্যেকার আস্তরণ কোয়ার্টজ বা বালু পাথর চুর্ণের সাথে অল্প পরিমাণে কাদা মাটি মিশ্রণে তৈরি। দ্বিতীয়ত, পাত্রের তলা আগুনে পোড়াবার বদলে কেবল শুকিয়ে নিলেই চলে। তৃতীয়ত, বিগালক হিসেবে পাথুরে চুন ব্যবহৃত না হওয়ায় যন্ত্রপাতিও কম দরকার হয়। যেসব পিণ্ড লোহায় ফসফরাস কম থাকে সেসব পিণ্ড লোহাকে ইস্পাতে রূপান্তরিত করতে এ্যাসিড বেসিমার পদ্ধতি উপযোগী। কেন না এ পদ্ধতিতে ফসফরাস দূর করা যায় না।

এল ডি পদ্ধতি

ক্ষারকীয় এবং এ্যাসিড পদ্ধতিতে অক্সিজেন জারিত হয়ে পরিবর্তকের মধ্যেকার উপাদানের তাপমাত্রা সবিশেষ বৃদ্ধি করে, কিন্তু বর্দ্ধিত তাপমাত্রার সিংহভাগ বেরিয়ে যায় ফালতু গ্যাস মাধ্যমে—প্রধানত নাইট্রোজেনের আধিক্য হেতু। যদি কেবলমাত্র তরল লোহাই পরিবর্তকে থাকত তবে বিশেষ কোন সমস্যা হতো না। কিন্তু, ইস্পাতের গুণগত মান বৃদ্ধি করার জন্য অনেক সময় বর্দ্ধিত হারে বর্জ্য লোহা বা ইস্পাত পরিবর্তকে ঢালা হয়। তখন আবার ঐ বর্দ্ধিত তাপমাত্রা এই বাড়তি লোহা বা ইস্পাতকে গলিয়ে ফেলার পক্ষে হয়ে পড়ে অপ্রতুল। সুতরাং প্রয়োজন দেখা দেয়ঃ

1. পরিবর্তকের মধ্যেকার তাপাঙ্ক মাত্রা স্থায়ী করে জারণ বিক্রিয়ার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা এবং

2. ধাতব পরিস্থিতির উন্নতি সাধন করে ইস্পাতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ কমান, এবং ফসফরাস বিযুক্তি আরও ফলপ্রসূ করা।

সমাধানে পৌঁছান একদিনে সম্ভব হয়নি। তবে কথায় বলে—লেগে থাকলে মেগে খায় না। দেখা গেল, যদি পরিবর্তকের মধ্যেকার মালের উপরিভাগ দিয়ে পরিশ্রুত অক্সিজেন ফুৎকারের সাহায্যে প্রবাহিত করা যায় তবে সমস্যা সমাধান সম্ভব।

এই আবিষ্কারের পথ ধরেই অষ্ট্রিয়ার লিনজ (Linz) এবং ডোনাভিতস (Donawits) শহরের দুটি কারখানা ইস্পাত উৎপাদনে যে নবীকরণ প্রতিষ্ঠিত করল তাই বর্তমানে এল ডি (LD)—শহর দুটির আদ্যাক্ষর পদ্ধতি নামে প্রসিদ্ধ।

এই পদ্ধতিতে ব্যবহৃত পরিবর্তকের তলা হয় নিরেট। আয়তনে একটি অতিকায় জালা। বলা হয় মুচি (crucible), দেখতে খানিকটা মুচির মত বলে। যে নল দিয়ে অক্সিজেন প্রবাহিত করা হয় তাকে বলা হয় অক্সিজেন বর্শা (oxygen lance)। বর্শার মতই মালের উপরিভাগ বিদ্ধ করে বলেই হয়তো এবং বিধ পরিচিতি। বর্তমান বিশ্বে এল ডি পদ্ধতিতেই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ইস্পাত উৎপন্ন হয় কারণ এ পদ্ধতিতে খুব দ্রুত গতিতে ভাল ইস্পাত তৈরী করা যায়।

খোলা মেঝে পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে কাঁচামাল হিসেবে বর্জ্য ইস্পাতই প্রধান। পিণ্ড বা তরল লোহাও অচ্ছ্যুত নয়। জারক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মিশ্রিত দাহ্য হাওয়া এবং পরিশ্রুত অক্সিজেন। কোথাও একমাত্র পরিশ্রুত অক্সিজেনই বর্শার সাহায্যে প্রবাহিত করে কার্য নির্বাহ করা হয়।

উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল প্রস্তুত এবং প্রয়োগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

মাল বোঝাই এবং খালাসের জন্য দেখা যাবে বিশালকায় ভারোত্তলনকারী চুম্বক। এটি আসলে বিশেষ ধরনের ঢালাই ইস্পাতে তৈরি গোল কিংবা চৌকো বাক্স। এই বাক্সের মধ্যে থাকে বৈদ্যুতিক তারের কুণ্ডলী। যে ক্রেন এই বাক্সের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে সেই ক্রেন চালকের কামরাতে থাকে বাক্সটার তারের কুণ্ডলীর সাথে বিদ্যুৎ যোগাযোগ ব্যবস্থা। প্রয়োজন মত ক্রেন চালক বোতাম টিপে বাক্সটাকে রূপান্তরিত করে অতি শক্তিধর চুম্বকে। এই অবস্থায়

বাক্সটা এগিয়ে যাবার পথে টন টন চৌম্বক পদার্থ নিজের মধ্যে টেনে নিয়ে গন্তব্য স্থানে পৌঁছে যায়। নির্দিষ্ট স্থানে এসে চালক বিদ্যুৎ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয় বোতাম টিপে। সাথে সাথে পুরো বোঝা পাকা ফলের মত সশব্দে নীচে পড়ে যায়।

এমন অনেক বর্জ্য থাকে যা আয়তনে খুব বেশি বড় হওয়ার ফলে চুল্লীর দরজা দিয়ে ঢোকান যায় না। তাই প্রয়োজন ভেঙ্গে নেওয়া। যে যন্ত্রটি এ কাজ করে তার নামটি বেশ মজাদার। খুলি ভাঙ্গা ক্রেন (skull cracker crane)। এটি আট-দশ টন ওজনের ইস্পাত গোলক। এ চুম্বকের সাহায্যে উপরের দিকে উঠে বর্জ্য খণ্ডের উপর বারে বারে পড়ে তাকে টুকরো টুকরো করে। পরে এই টুকরোগুলি বাক্স বোঝাই হয়ে চলে যায় চুল্লীর ক্ষুধা মেটাতে।

যেসব বর্জ্য খণ্ডে ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ একটা বিশেষ হারের চাইতে বেশি, তা কিন্তু হয় চুম্বক প্রভাব মুক্ত। সুতরাং, এদের পরিবহণ চুম্বক বাক্স দ্বারা সম্ভব নয়। যে যন্ত্রটি এ কাজে ব্যবহৃত হয় তাতে থাকে ভুতের মত লম্বা লম্বা দুটি হাত। আমাদের দুহাতে থাকে পাঁচটি করে দশ আঙ্গুল। আর যন্ত্রটির দুহাতে দৈত্যের মত বড় বড় ষোল থেকে কুড়িটি। বিশাল বিশাল বর্জ্য স্তূপ অবলীলা ক্রমে দুহাতে জাপটে ধরে ক্রেনের হুকে ঝুলতে ঝুলতে যথা-স্থানে চলে যায়।

যে বর্জ্যের কথা উপরে বলা হল সেই তালিকায় আছে ঃ ক্যানেস্তারা, টিন এবং বালতি জাতীয় বস্তু। আয়তনের তুলনায় বেশ হালকা। মাত্র কয়েক কেজি মালেই বোঝাই করার বাক্সটা ভরতি হয়ে যাবার কথা। অথচ মাল চাই টন টন। তাছাড়া, বার বার মাল বোঝাই করার ঝক্কি ঝামেলা, সময় নষ্ট তো আছেই। উপরন্তু, ঘন ঘন চুল্লীর দরজা খোলা হয়ে বাইরের হাওয়া চুল্লীতে প্রবেশ করে নানা বিঘ্ন সৃষ্টি করে এই সমস্যার ত্রাণকর্তা হল ঔদক (hydraulic press) নামক একটি যন্ত্র। এটি বর্জ্য বস্তুগুলিকে চারদিক থেকে প্রচণ্ড চাপের মধ্যে ফেলে প্রায় নিরেট পিণ্ড বানিয়ে ফেলে।

চুল্লীতে মাল ঢালার যন্ত্রটিও বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। চুল্লীর মুখো-মুখি মেঝেতে পাতা এই যন্ত্রটি কড়ির (beam) সাথে যুক্ত এবং নানাভাবে ঘোরান ফেরান বা আগু পিছু করার যোগ্য। চালনা করা হয় ক্রেনের সাহায্যে। ক্রেন চালক তার নিজ কামরায় বসে বর্জ্য বোঝাই বাক্স এনে চুল্লীর দরজা খুলে ভেতরে ঢুকিয়ে বাক্সটাকে উলটে মাল খালাস করে বাক্সটা বার করে নিয়ে

আসে। এই সুযোগে চালক চুল্লীর ভেতরের অবস্থাটাও একবার দেখে নেবার সুযোগ পায়।

এই পদ্ধতিতে নানা গুণমানের ইস্পাত উৎপন্ন করা সম্ভব এবং সব দেশেই এর বহুল প্রয়োগ।

তাড়িত পদ্ধতি

নদী পারাপার করার জন্য বৃহদাকার সেতু, যেমন হওড়া সেতু, কামানের নল জাতীয় নানা দ্রব্যের সমগোত্রীয় শিল্পের জন্য বিশেষ গুণমানের ইস্পাত প্রয়োজন হয়। কিছুকাল আগেও তা উৎপন্ন করতে নানা জটিল সমস্যার মোকাবিলা করতে হতো। শুনেছি, তিরিশের দশকে যখন হাওড়ার প্রথম সেতুটি নির্মিত হয় তখন এ জাতীয় ইস্পাত উৎপন্ন করার মত তেমন কোন স্বীকৃত কারখানা আমাদের দেশে ছিল না। চুক্তি অনুযায়ী সেতু প্রস্তুতকারী সংস্থা নির্দিষ্ট গুণমানের ইস্পাত উৎপাদন করার ভার দেন টাটা আইরণ এণ্ড ষ্টিল কোং-কে। এবং তারা সেই দায়িত্ব কৃতিত্বের সাথেই পালন করতে পেরেছিলেন। বর্তমানে এবংবিধ গুণমানের ইস্পাত উৎপাদনে তাড়িত পদ্ধতি পৃথিবীর সর্বত্রই প্রচলিত। কার্বন কিংবা গ্র্যাফাইটের তাড়িদ্বারের (Electrode) মধ্যে তাড়িত চাপ (electric arc) চুল্লীর ছাত এবং ইস্পাতের মধ্য দিয়ে প্রবিষ্ট করিয়ে পরিশ্রুত করার কাজ সম্পন্ন হয়।

অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় কাঁচা মালের ব্যাপারে তেমন একটা বাছাবাছি করার প্রয়োজন হয় না। অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের কাঁচা মাল থেকেও অতি উচ্চ মানের ইস্পাত উৎপাদন করা সম্ভব। তবে সময় একটু বেশি প্রয়োজন। এই যা।

মিশ্র ইস্পাত উৎপাদনে তাড়িত পদ্ধতির ভূমিকা অপরিসীম মূল্যবান। কারণ, দরকারী ক্রোমিয়াম, ভানেডিয়াম, টাংষ্টেন এবং মলিবডিনাম প্রভৃতি মৌল পদার্থ নির্দিষ্ট সময়ে মিশ্রিত করা সম্ভব। চুল্লীতেও কোন গ্যাস প্রবেশ করতে পারে না। হাওয়ার অক্সিজেন অনুপ্রবেশও রোধ করা সম্ভব। ফলে, চুল্লীর মধ্যে কোন অবাঞ্ছিত জারণ বিক্রিয়া সংঘটিত হতে পারে না। সুতরাং, পরিশোধন চলাকালে ইস্পাতের কোন মৌল পরিবর্তন ঘটে না। উপরন্তু, ক্ষতিকর ফসফরাস, সালফার, এবং অক্সিজেন বিদূরিত হয়। থাকলেও তা অতি নগণ্য।

পরিশোধন চলাকালে কিছু সময় অন্তর অন্তর নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার পর দরকার মত সংযুতি হেরফের ঘটান সম্ভব। অর্থাৎ, তাড়িত পদ্ধতিতে ধাতব নিরন্ত্রণ খুবই ফলপ্রসূ হয়।

তাড়িত পদ্ধতিতে যে কেবলমাত্র ঘন কাঁচামালই বিশেষ ধরনের ইস্পাত উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় তাই নয়, ক্ষারকীয়, এল ডি, এবং খোলা মেঝে পদ্ধতিতে উৎপন্ন তরল ইস্পাতও প্রয়োজন মত পরিশ্রুত করা হয় তাড়িত পদ্ধতির মাধ্যমে।

তরল ইস্পাত ব্যবহার করলে ঘন কাঁচামাল গলাতে কিছু পরিমাণ বাড়তি উত্তাপ, জ্বালানি এবং সময়ের প্রয়োজন। কিন্তু, তাড়িত পদ্ধতিতে এই বাড়তি ঝামেলা সংকোচ করা সম্ভব। ফলে, উৎপাদন খরচও কমে।

চুল্লীতে মাল ঢালার পদ্ধতি অভিনব। চুল্লীর ছাত এমন ভাবে তৈরি যাতে এটিকে দরকার মত উপর নীচ এবং ঘোরান যায়। যে অতিকায় ধামা করে চুল্লীতে কাঁচা মাল ঢালা হয় তার তলাটি বিশেষ ধরনের। অনেকগুলি ফিতার সাথে বকলস বাঁধা থাকে। মাল বোঝাই ধামাটি এনে চুল্লীর পাত্রে বসান হয়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বকলসগুলি গলে গিয়ে ফিতে গুচ্ছকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ফিতে গুচ্ছ উচ্চ তাপরোধী ইস্পাতে তৈরি। সুতরাং ফিতেগুলি অক্ষত অবস্থাতেই চুল্লী থেকে বার করে নিয়ে আসা যায়।

মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই এক ধামা মালে চুল্লীর পাত্র ভরে যায়। বলা বাহুল্য সবই ঘটান হয় যান্ত্রিক সহায়তায়। পরিশোধন পর্ব শেষ হবার পর চুল্লীর পাত্রটি কাত করে তরল ইস্পাত সংগৃহীত হয়।

প্রথমে যে ভারী এবং বিশেষ গঠন শৈলী কর্মের জন্য ইস্পাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাছাড়াও স্প্রিং ইস্পাত, তাপ এবং সম্প্রসারণ-রোধী ইস্পাত, চুম্বক বা অচুম্বক ইস্পাত, সকল প্রকার রাসায়নিক বিক্রিয়া-রোধী ইস্পাত, টারবাইন যন্ত্রের ফলক উপযোগী ইস্পাত, কপাটক (valve) ইস্পাত, নানা জাতের সাধন (tool) ইস্পাত যাদ্বারা অন্য সাধনী কাটা যায়, অতি দ্রুতী (high speed) ইস্পাত প্রভৃতি নানা বিশেষ প্রয়োগের জন্য তাড়িত পদ্ধতিতে উৎপন্ন ইস্পাতই প্রয়োজন।

এতসব বলার পর একটা প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই মনে উদয় হতে পারে। এতই যদি সুবিধা তবে একমাত্র তাড়িত পদ্ধতিতেই তো ইস্পাত উৎপাদন করা উচিত। কিন্তু, মনে রাখা ভাল যে সাধারণ মানের ইস্পাতের চাহিদা এই তাড়িত পদ্ধতিতে উৎপন্ন ইস্পাতের চাহিদার চাইতে শতগুণ বেশি। সুতরাং, যেখানে

বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা সীমিত এবং ব্যয় সাধ্য সেখানে ব্যাপক তাড়িত পদ্ধতি চালু করা একান্ত অবাস্তব।

ইস্পাতের তাপ পরিচর্যা (Heat treatment)

মানব শিশুর জন্মের পর থেকেই তাকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করে তুলতে নানা পরিচর্যা শুরু হয়। কিছু কিছু মারাত্মক রোগ, যেমন—পোলিও, যক্ষার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য ওষুধ ইনজেকসন প্রয়োগ করা হয়। ইস্পাতের বেলাতেও অভিজ্ঞতা সূত্রে দেখা গেছে যে জন্ম লগ্নে তা যত ভাল প্রসূতি সদনে কিংবা বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সেবিকার হাতেই ঘটুক না কেন—উৎপন্ন ইস্পাতে বেশ জটিলতা থেকেই যায়। জটিলতা জনিত ত্রুটি দূর না করে ভোগ্য পণ্য তৈরি করলে উৎপন্ন পণ্যে নানা বিঘ্নের বীজ উপ্ত থেকে যায়।

এই কারণে উৎপন্ন ইস্পাতকে প্রথমে নিবিড় পরীক্ষা নিরীক্ষা করে পরিচর্যার স্বরূপ নির্ণয় করে নিতে হয়। পরে বিভিন্ন স্তরে তাপাঙ্ক মাত্রা বাড়িয়ে কমিয়ে, জলে ডুবিয়ে ঠাণ্ডা করে পরিচর্যা করা হয়। তবেই সাধারণভাবে উৎপন্ন ইস্পাত জন্ম-লগ্নের দোষ ত্রুটি মুক্ত হয়। কিন্তু, যেসব বিশেষ শিল্প কর্মের জন্য উচ্চমানের ইস্পাত প্রয়োজন সেসব ক্ষেত্রে পরিচর্যা খানিকটা জটিল রোগীর পরিচর্যার মত। সমান দক্ষতা এবা সংবেদনশীলতার একান্ত কর্তব্য। কারণ, ইস্পাতের তাপ পরিচর্যার সাথে জড়িয়ে আছে বিভিন্ন মানের ইস্পাতের আণবিক গঠন সংক্রান্ত গভীর জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার প্রশ্ন। তাই ইস্পাত উৎপাদনে তাপ পরিচর্যা একটা বিশেষ কৌলীন্যের দাবিদার।

ইস্পাতের ধাতুমল উপজাত

ইস্পাত উৎপাদনে, বিশেষ করে ক্ষারক্ষীয় পদ্ধতিতে, যে ধাতুমল নির্গত হয় তাতে বেশ ভাল পরিমাণে ফসফরিক এ্যাসিড থাকে। এই ধাতুমল শুকিয়ে ভাল ভাবে গুঁড়িয়ে মাটিতে মেশালে তা মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। কৃষি কর্মে তাই এর চাহিদা বেশ ভাল।

ধাতুমল বিশেষ ধরণের ছাঁচে ঢালাই করে শুকিয়ে মালখানায় এনে দু-তিন পর্যায়ে চূর্ণ বিচূর্ণ করা হয়। এই গুঁড়ো স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে ছোট বড় নানা আয়তনের থলিতে ভরতি হয়ে বাজারে চলে যায় ক্রেতার চাহিদা মেটাতে।

এই প্রসঙ্গে আমার বৃদ্ধা মায়ের একটা মন্তব্য মনে পড়ে গেল। একদিন বাজার থেকে বেশ বড় বড় টমেটো এনে মাকে দেখাতেই তিনি বলে উঠলেন—এই বিলাতি বাইগণগুলি দেখতে ঐ বড়। আসলে অখাদ্য, অখাদ্য। আইজ কাইল ক্ষ্যাতে ঐ যে ফসফস নাকি য্যান দ্যায় হৈতেই সোয়াদ নষ্ট করে।

খোলা মেঝে পদ্ধতিতে প্রাপ্ত ধাতুমলও উপজাত রূপে ব্যবহার যোগ্য। কিন্তু, এতে লোহার পরিমাণের হার বেশ ভাল হওয়ায় এই ধাতুমল অনেক ক্ষেত্রে মারুত চুল্লীতে পুনরায় ব্যবহার করা হয় কাঁচামাল হিসেবে।

বর্জ্য গ্যাস আশ্রিত ধূলি নিষ্কাশন

ইস্পাত কারখানায় অক্সিজেনের ব্যবহার দিনকে দিন বৃদ্ধির দিকে। ফলে বর্জ্য গ্যাস থেকে ধূলি নিষ্কাশন সমস্যাও মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে পরিবেশ দূষণের উৎস রূপে। ইস্পাত কারখানার দিকে তাকালেই দেখতে পাবেন বিশেষ একটা চিমনি থেকে ভক ভক করে লালচে ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে। অক্সিজেনের সঙ্গে জারিত হয়ে অসংখ্য লৌহ-কণা আইরণ অক্সাইডে পরিণত হয়ে বর্জ্য গ্যাসের সাথে মিশে গিয়ে ধোঁয়া এমনি লালচে ভাব অবলম্বন করে। লৌহ-কণা ছাড়াও এই বর্জ্য গ্যাসে মিশে থাকে চুন, ধাতুমল, এবং নিষ্ঠীবন জাতীয় ধূলি।

ক্ষারকীয় বেসিমার এবং এল ডি পদ্ধতি ছাড়া অন্য পদ্ধতিতে উৎপন্ন বর্জ্য গ্যাসের পরিশোধন মারুত চুল্লী নির্গত ধোঁয়া পরিশোধন কর্মের অনুরূপ। ক্ষারকীয় এবং এল ডি-র বেলায় সমস্যা খানিকটা হালছাড়া নৌকোর মত। প্রায় বিস্ফোরণ মাধ্যমে যে অপরিমেয় ধূম উদগীর্ণ হয় তার তাপাঙ্ক মাত্রাও থাকে অত্যধিক। ফলে, একে বাগে এনে পরিশোধন একরকম অসম্ভব। তবে পরিবেশ দূষণের কথা মনে রেখে বিশেষজ্ঞরা নানা উপায়ের কথা অবিরত চিন্তা করে যাচ্ছেন। তাই ভরসা, সুফল একদিন ফলবেই ফলবে।

•

ইস্পাত ফাউণ্ড্রী

বিভিন্ন ইস্পাত কারখানায় যত ইস্পাত উৎপন্ন হয় তার সিংহ ভাগ চলে যায় পিণ্ডাকারে নানা আবর্তন কর্মশালায় (rolling mills)। সেখানে পিণ্ডগুলি রূপান্তরিত হয় কড়ি, বরগা, লম্বা ফালি, দণ্ড প্রভৃতি নানা জাতের দ্রব্যে। কিছু

কিছু আবার যায় সেসব কর্মশালায় যেখানে হাতুড়ির ঘায়ে বা পেষণ যন্ত্রের সাহায্যে তৈরি হয় ক্র্যাঙ্ক স্যাফট এবং নানা জাতের যন্ত্রাংশ।

যেসব দ্রব্য আকার এবং গঠনে জটিল, এবং আবর্তন বা পেষণ পদ্ধতিতে নির্মাণ করা সম্ভব হয় না, সেসব ক্ষেত্রে ইস্পাত গলিয়ে দুর্গল বস্তুতে তৈরি ছাঁচে ঢালাই করে কাঙ্ক্ষিত বস্তু নির্মিত হয়।

ছাঁচে ঢালাই পদ্ধতি পিণ্ড লোহাকে ছাঁচে ঢালাই-এর অনুরূপ। তবে ইস্পাতের বেলায় ছাঁচের মাল মশলা এমন হওয়া চাই যা শেষ পর্যন্ত ছাঁচটিকে অতি তাপরোধী করে তুলতে পারে। কাঁচামালের মধ্যে আছে : দো-আঁশ মাটি, ভারী বালু, কাঁচা কাদা, এবং অগ্নি-সহ মৃত্তিকা। এই মিশ্রণের সাথে যোগ করা হয় কাঠের গুঁড়া কিংবা অন্য কোন সহজ দাহ্য পদার্থ। উদ্দেশ্য : ছাঁচটিকে দহন প্রথায় শুকিয়ে নেবার সময় যাতে দাহ্য বস্তু পুড়ে যায়, এবং ছাঁচটিকে গ্যাস অনুপ্রবেশ প্রবণ করে তুলতে পারে। অর্থাৎ ছাঁচটি যাতে সরন্ধ্র হয়।

এমন অনেক যন্ত্রাংশ আছে যা অত্যধিক পীড়নসহ হতে হবে অথচ দেওয়ালটি হবে পাতলা। পূর্বে এসব ভোগ্য পণ্য ছাঁচে করে তৈয়ার করার কৃত কৌশল জানা না থাকায় উৎপন্ন হতো বিশেষ শ্রমসাধ্য উপায়ে এবং দামও হতো বেশি। বর্তমানে এই কৃত কৌশল প্রযুক্তিবিদদের আয়ত্তে। ফলে ব্যয় হ্রাস এবং উৎপাদন বৃদ্ধির হার বাড়ান সম্ভব হয়েছে।

বড় মাপের ঢালাই কাজে বেসিমার পদ্ধতিতে উৎপন্ন ইস্পাত প্রধান্য পেয়ে থাকে। কিন্তু, পাতলা দেয়াল যুক্ত যন্ত্রাংশের জন্য খোলা মেঝে পদ্ধতিতে উৎপন্ন ইস্পাতই প্রথম পছন্দ। কারণ, এই পদ্ধতিতে প্রাপ্ত তরল ইস্পাতের তাপাঙ্ক মাত্রা তুলনায় একটু বেশি এবং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ফাঁক-ফোকরে এর অনুপ্রবেশ ক্ষমতা প্রবল।

ছাঁচ থেকে বার করে আসার পর উৎপন্ন দ্রব্যের দেহে লক্ষ্য করা যায় অনেক কিছু মাথা উচিয়ে থাকা খোঁচা খোঁচা দাড়ির মত। অবস্থা বুঝে এসব সাফাই করতে ব্যবহৃত হয় শিখা টর্চ (flaming torch), পালিশ চাকা (polishing wheel), করাত, হাওয়া বাটালি, কিংবা প্রচণ্ড বালুকা ঝাপটা। প্রায় একই প্রথা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় লৌহ ফাউণ্ড্রীতে।

ইস্পাতকে অন্যান্য রূপদানকারী উপায়

পূর্বেই বলা হয়েছে যে উৎপন্ন ইস্পাতের সিংহভাগ চলে যায় পীড়ন বা আবর্তন কর্মশালায়। অবশিষ্টের কিছু অংশ যায় ফাউন্ড্রীতে ঢালাই হতে। বাদবাকি যায় বিভিন্ন উপায়ে ভোগ্য পণ্য তৈরি হতে যা ছাঁচে ঢালাই করে নির্মাণ করা সম্ভব নয়। তারই সামান্য দু একটি হল ঃ

সংনমন বা পীড়নের জনপ্রিয়তা অনেক কারণে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে এতে ইস্পাতের গুণমানে উন্নতি ঘটে এবং আরও শক্তিধর হয়। পীড়নের ক্ষেত্রে হাতুড়ি ব্যবহারের প্রচলন সেই আদ্যি কাল থেকে। গ্রামে-গঞ্জে এখনও লোহার স্থানীয় চাহিদা এভাবেই মেটায়।

কিন্তু, বর্তমানে শিল্প জগতের চাহিদা বিপুল। চাহিদা মেটাতে অনেক কারখানাতেই ব্যবহৃত হয় বাষ্প বা সংনমিত হাওয়া চালিত হাতুড়ি। এগুলি খুব ভারী। টন টন ওজন। চালু অবস্থায় প্রচণ্ড আওয়াজে চারদিক কাঁপিয়ে তোলে। সৃষ্টি হয় একটা বিশ্রী পরিবেশ। এসব কারণে, অনেক ক্ষেত্রে ঔদক পেষণ যন্ত্রের ব্যবহার চালু দেখা যায়। যন্ত্রটি ইস্পাত পিণ্ডের উপর পুরোপুরি পেষণ দ্বারা গভীরে প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু হাতুড়ির ক্ষেত্রে প্রভাব ঘা পড়ার স্থানটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকে। তবে মাঝারি এবং ছোট ছোট পণ্যের ক্ষেত্রে চাহিদার পরিমাণ বেশি হলে হাতুড়িই প্রথম পছন্দ ; কারণ, এতে সময় সংক্ষেপ করা সম্ভব।

ভারী ঔদক যন্ত্রের পেষণ ক্ষমতা 50000 টনের মত।

পীড়ন বা পেষণের পূর্বে ইস্পাত পিণ্ড বিশেষ ধরনের চুল্লীতে গনগনে লাল করে নিতে হয়। শীতল পিণ্ডকে চুল্লীতে নিয়ে যাওয়া, গনগনে লাল তপ্ত পিণ্ডকে নিয়ে এসে পীড়ন যন্ত্রের নির্দিষ্ট জায়গাটিতে স্থাপন করা সবই সম্পন্ন হয় বিশেষ ধরনের যন্ত্র এবং ক্রেনের সাহায্যে।

শূন্যে গর্ভ বৃহদাকারের কিছু বস্তু বানাতে হলে ইস্পাত পিণ্ডের উপর থেকে একটি ছিদ্র করে নিতে হয় ভারী পীড়ন যন্ত্রের সাহায্যে। পরে ভোগ্য পণ্যের আকার অনুযায়ী যান্ত্রিক উপায়ে বারে বারে পীড়ন প্রক্রিয়া চলতে থাকে যত সময় পর্যন্ত না শূন্য গর্ভের মাপ এবং দেওয়াল নির্দিষ্ট মানে এসে যায়।

এমন অনেক ভোগ্য পণ্য আছে যা আবর্তন বা পীড়ন-পেষণ পদ্ধতিতে নির্মাণ করা খুবই মুশকিল। এদের বেলায় নিঃসারী পদ্ধতি (extrusion process) জনপ্রিয়। ছোট মাপের একটি ইস্পাত পিণ্ডকে প্রায় 1250° সেলসিয়াসে

উত্তপ্ত করে নিতে হয়। পরে এটিকে একটি বেলনাকৃতি পাত্রের মধ্যে স্থাপিত করা হয়। এই পাত্রটির ভেতরের দেওয়াল কাচের গুঁড়োতে ভালভাবে লিপ্ত করা থাকে। এই পাত্রের সম্মুখ ভাগ তাপ সহনশীল ইস্পাতের কাঠামোতে (die) বন্ধ করা হয়। কাঠামোটির গঠন ভোগ্য পণ্যের প্রস্থচ্ছেদের (cross section) সমান। কাঠামোর সামনে রাখা থাকে গুঁড়ো কাঁচের জমাট বাঁধা পাটা। পেছন দিক থেকে ইস্পাত পিণ্ডটিকে সামনের দিকে এগিয়ে আনা হতে থাকে ধাক্কা দিতে দিতে। যে বস্তুটি শেষ পর্যন্ত সামনের দিক দিয়ে বেরিয়ে আসে সেটিই হল কাঙ্ক্ষিত ভোগ্য পণ্য। সময় দরকার হয় মাত্র কয়েক সেকেণ্ড। কাচের গুঁড়ো প্রচণ্ড উত্তাপে গলে গিয়ে পিণ্ডটির বহির্ভাগ, বেলনাকৃতি পাত্র এবং কাঠামোর ভেতরের অংশ তেল তেলে করার কাজ করে থাকে যাতে কোন বাধার সৃষ্টি না হয়।

আবর্তন কর্মশালা

ইস্পাত শিল্পে আবর্তন কর্মশালার গুরুত্ব অপরিসীম। টন টন ওজনের ইস্পাত পিণ্ডকে চাহিদা অনুযায়ী আংশিক বা পুরোপুরি রূপান্তর ঘটিয়ে ছোট, মাঝারি বা বড় শিল্প কর্মের জন্য বাজারে ছাড়া হয়।

খুব ছোট মাপের কর্মশালাতেও কম করে এক জোড়া আবর্তক (roll)-দুটি অতিকায় বেলন—একটির উপর অন্যটি স্থাপিত অবস্থায় দেখা যায়। আবর্তকের দুই গ্রীবা (neck) অর্থাৎ দুটি দিক অক্ষনাড়িতে (bearings) প্রবিষ্ট। নোদানা (drive) সাহায্যে আবর্তক দুটিকে দুমুখো ঘোরাবার ব্যবস্থা। ফলে পিণ্ডটি আবর্তক দুটির মধ্যে পিষ্ট হয়ে ক্রমশ পাতলা এবং লম্বা হতে থাকে। অবশ্য, প্রতিবার আবর্তন শুরু হবার পূর্বে বেলন দুটির আপেক্ষিক দূরত্ব পিণ্ডের স্থূলতা থেকে সামান্য কম করে নিতে হয়।

বেলনকে ঘিরে যদি খাঁজ কেটে নেওয়া হয় তবে পিষ্ট হবার সময় খাঁজে মাল প্রবেশ করে তৈরি জিনিসটিতে সেইমত উচ্চতা এবং আকার নিয়ে আসতে সাহায্য করে।

তবে, প্রায় সব কর্মশালাতেই থাকে একাধিক রকমের আবর্তন যন্ত্র : দু' আবর্তক (two high), তিন আবর্তক (three high), চার আবর্তক (four high) এবং দ্বি-দ্বিগুণ (double due)।

প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় যন্ত্রে থাকে যথাক্রমে দুই, তিন এবং চারটি

আবর্তক। একটির উপর অন্যটি স্থাপিত। দ্বি-দ্বিগুণ আবর্তকটি হচ্ছে একই কাঠামোতে দু' জোড়া আবর্তকের সমন্বয়। এটিকে দু' আবর্তক যন্ত্রের পরিপূরক বলা হয়। কারণ, দু' জোড়া আবর্তক বিপরীত মুখী। সুতরাং, প্রতিবার আবর্তনের (Pass) পর ঘূর্ণনের দিক পরিবর্তন করতে হয় না যেটা দু' আবর্তকের বেলায় করতে হয়। এ কারণেই, কর্মশালায় এর পরিচিতি উল্টো মুখী দু' আবর্তক (two high reversing mill)। তবে দ্বি-দ্বিগুণ যন্ত্রটি ভারী পিণ্ড আবর্তনের পক্ষে অনুপযোগী। তিন আবর্তক যন্ত্রে পিণ্ড প্রথম পরিক্রমার মধ্য এবং তলাকার আবর্তকের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে যাবার পর ফিরে আসে মধ্য এবং উপরিভাগের আবর্তকের মধ্য দিয়ে। ঘূর্ণন দিক পালটাতে হয় না।

তাত্ত্বিক বিচারে আবর্তকের ব্যাস যত কম হবে ততই সে পিণ্ডটি দৃঢ়ভাবে কামড়ে ধরে সহজে স্থূলতা কমাতে পারবে। কিন্তু, বাস্তব ক্ষেত্রে প্রচণ্ড চাপের মুখে আবর্তকের বেঁকে যাবার সম্ভাবনা থাকে। ফলে, আবর্তিত বস্তুটি অসম হতে বাধ্য। পাত বা ফালির ক্ষেত্রে সামান্যতম হেরফেরও বিষম বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে, এই যন্ত্রের কার্যকরী দৈর্ঘ্যে স্থাপিত বাকি আবর্তকগুলির ব্যাস হয় ক্রমবর্ধমান।

পাত এবং ফালি থেকে তৈরি এমন অনেক ভোগ্য পণ্য আছে যা প্রবল ঝাপটা সহনশীল হতে হবে। এ জাতীয় পাত এবং ফালি চার আবর্তক কর্মশালায় আবর্তিত হয়। তপ্ত ইস্পাত পিণ্ডকে পীড়ন করলে পিণ্ডের উপরের দিক থেকে খোসা বা অপবস্তু ছিটকে পড়তে দেখা যায়। ফলে ভোগ্যপণ্যে নানা অপপ্রভাব সৃষ্টি করে থাকে। তাই, ক্ষেত্র বিশেষে নানা যান্ত্রিক এবং কায়িক পদ্ধতিতে প্রাথমিক বা অর্দ্ধ তৈরি পিণ্ডের চারদিক দোষমুক্ত করে নিতে হয়।

বর্দ্ধন কর্মশালা

পৃথিবীতে এমন কোন মানুষ নেই যিনি সব কর্মে পারদর্শী। তেমনি এমন কোন যন্ত্র বা পদ্ধতিও নেই যা দ্বারা সব কিছু তৈরি করা সম্ভব। একই নিয়মে কোন একটি আবর্তন যন্ত্র প্রাথমিক আবর্তন কর্ম শেষ করে নিজ কর্মফল অপরের হাতে তুলে দেয়। কেননা, একবার ভেবে দেখুন তো টন টন ওজনের বিশালাকায় এক একটি পিণ্ডকে—পাঁচ থেকে কুড়ি টন ওজনের, কি একই কর্মশালায় তিন সাড়ে তিন মিলিমিটার ব্যাসার্দ্ধের তারে রূপান্তরিত করা সম্ভব। সুতরাং, যে

পর্যায় ক্রমে রূপান্তর ঘটতে থাকে তার প্রাথমিক পর্যায় সাধন করে বর্ধন কর্মশালা (blooming mill)।

আবর্তন কর্ম ইস্পাতের লোহিত তপ্ত (red hot) নমনীয় অবস্থাতেই করতে হয়। কর্মশালায় বলা হয় আবর্তন তাপাঙ্কমাত্রা (rolling temperature)। যদিও পিণ্ডগুলি ইস্পাত কারখানা থেকে এ অবস্থাতেই আসে, কিন্তু, আসার সাথে সাথেই তো আর চলে যায় না আবর্তক যন্ত্রে পিষ্ট হতে। সুতরাং, তাপাঙ্কমাত্রা সঠিক অবস্থায় রাখার জন্য পিণ্ডগুলি বিশেষ ধরনের খাদে (soaking pit) পরপর সাজিয়ে রেখে তেলের আগুন বা তাড়িত তাপের সাহায্য নেওয়া হয়।

সময় হলে পিণ্ড এক বিশেষ ধরনের গাড়িতে চেপে আবর্তন যন্ত্রের সামনের টেবিলে একের পর এক সাজান বেলনের উপর শায়িত হয়। যেন অস্ত্রোপচারের জন্য রোগীকে টেবিলে শোয়ান হল। একজন নিয়ন্ত্রক নির্দিষ্ট বিশেষ কামরায় (cabin) দাঁড়িয়ে যান্ত্রিক উপায়ে আবর্তন যন্ত্রের প্রাথমিক হাঁ-এর পরিমাপ স্থির করে নেন। পরে ঠেলার সাহায্যে পিণ্ডটিকে হাঁ-এর মুখে স্থাপিত করে আবর্তক ঘুরিয়ে দেন। পিণ্ডটি পিষ্ট হতে হতে গড় গড় করে বেলনগুলির উপর দিয়ে অপর দিকে চলে আসে। পরিক্রমা শেষে দেখা যাবে পিণ্ডটির স্থূলতা কিছু কমেছে, কিন্তু লম্বায় কিছু বেড়েছে।

সহসা দেখা যাবে অনেকগুলি ইস্পাতের আঙ্গুল বেলনের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে পিণ্ডটাকে মুঠোর মধ্যে আঁকড়ে ধরে নব্বই ডিগ্রী ঘুরিয়ে দিয়েছে। এবারে নিয়ন্ত্রক তার পূর্ব নির্দিষ্ট সূচী অনুযায়ী হাঁ-টা আর একটু কমিয়ে পূর্বেকার উপায়ে পিণ্ডটিকে সামনের দিকে নিয়ে আসার চাবি ঘুরিয়ে দিয়েছে। এমনি করেই পিণ্ডটার আসা যাওয়া চলতে থাকে মাকুর মত যতক্ষণে না কাঙ্ক্ষিত মাপে এসে যায়।

এই আগু-পিছু পরিক্রমা এত দ্রুত গতিতে চলে যে পিণ্ডের তাপাঙ্কমাত্রায় বিন্দুমাত্র ঘাটতি হবার সম্ভাবনা থাকে না উপরন্তু, পিষ্ট হতে গিয়ে ভিতরকার ঘর্ষণে বরং তাপাঙ্কমাত্রা কিছু বেড়েই যায়। এ অভিজ্ঞতা তো আমাদের সকলেরই হয় যখন আমরা দু'খণ্ড ধাতুকে ঘষটাই। বর্ধন কর্মশেষে পণ্যটি চলে যায় যন্ত্রশালার পেছনে রাখা বেলন সম্বলিত টেবিলে। সেখানে বস্তুটি পূর্ব নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যে কৃন্তক যন্ত্রে (shearing machine) কেটে পাঠিয়ে দেওয়া হয় যন্ত্রশালার মাল গুদামে কিংবা অন্য কোন আবর্তন কর্মশালায় পরবর্তী পর্যায়ে রূপান্তরের জন্য।

মাঝারি এবং ভারী পাত (Plate) কর্মশালা

পাত ইস্পাত সাধারণত চেপ্টা ফলক পিণ্ড (slabbing ingot) থেকে আবর্তিত হয়। ওজনে এই পিণ্ডগুলি পাঁচ থেকে কুড়ি টন পর্যন্ত হয়। কোন কোন দেশে আয়ুধের জন্য নির্দিষ্ট পাত চল্লিশ, এমন কি দেড়শ টনের ফলক থেকেও আবর্তিত হয়। এদেরকে আবর্তিত করতে যন্ত্রটিও যে বিশেষ ধরনের হবে তা বলাই বাহুল্য।

আবর্তক আধারে থাকে দুটি কার্যকরী আবর্তক। সাথে আরও দুটি সহায়ক। অনেক যন্ত্রে অনুভূমিক (horizontal) আবর্তকের সামনে বা পেছনে আরও এক জোড়া আবর্তক দাঁড় করান থাকে যাতে পাতের ধার নিখুঁতভাবে এবং সঠিক মাপে আবর্তিত হতে পারে। এ ধরনের আবর্তন যন্ত্র সর্বার্থ-সাধিকা (universal mill) নামে খ্যাত।

যন্ত্রশালার উচ্চতা মোটামুটি বার মিটারের মত। ওজনে প্রায় আড়াইশ টনের মত। যখন দুটি তাড়িত মোটর এই অতিকায় দৈত্যটিকে চালু করে, তখন তার দেহে জেগে ওঠে প্রায় পঁচিশ হাজারের মত অশ্বশক্তি।

উৎপাদন শেষে পাতগুলি কর্মশালার পেছনে রাখা অনুভূমিক যন্ত্রে সরল করা হয়। পরে হীম ঘরে শীতল করে নিরীক্ষণ করা হয়। উদ্দেশ্য কোন দোষ ত্রুটি আছে কিনা। থাকলে তা দূর করার মানসে। প্রয়োজনবোধে এই কর্মশালায় পুরু পাতও আবর্তিত হয় এবং চলে যায় সরু বা পাতলা পাত আবর্তন কর্মশালায় কাঁচামাল হিসেবে।

সরু বা পাতলা পাত (Sheet) কর্মশালা

আজকাল গ্রামেগঞ্জে হামেশাই মোটর, বাস বা জিপ দেখতে পাওয়া যায়। বড় বড় শহরে বা নগরে তো এরা যান-জটের মুখ্য নায়ক। এদের দেহাবরণের জন্য চাই পাতলা পাত। তাছাড়া আছে নানাজাতের টিনের পাত্র, বিদ্যুৎ সরঞ্জাম, গ্যাস কুকার, এবং আসবাব-পত্র। সুতরাং, চাহিদা বিপুল। এর সাথে পাল্লা দেবার জন্য প্রায় স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক উপায়ে এই পাত উৎপন্ন হয়। উৎপাদন কর্মে কায়িক শ্রম বলতে আজ আর তেমন কিছু নেই। নিয়ন্ত্রণ কক্ষে বসে একজন মানুষই চাকা ঘুরিয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব পর্ব সমাধা করতে পারে। পাতগুলি পাতলা হওয়ায় আবর্তন সময়ে এসবের বেধ হ্রাসের হারও তেমন কিছু

উল্লেখযোগ্য হতে পারে না। উপরন্তু, পাতগুলির দ্রুত শীতল হবার প্রবণতা থাকে। ফলে, সময় বাঁচাতে এবং চাহিদার সাথে পাল্লা দিতে পাত জোড়ায় জোড়ায়, এক জোড়ায় থেকে আট জোড়া পর্যন্ত আবর্তিত হয়। আবর্তন শেষে পাতগুলি চিপসে যাবার দাখিল হয়। পাতগুলি পরে আলাদা আলাদা করে নিতে হয় জোর জবরদস্তি করে। পাতগুলির গঠন শৈলী মজবুত হওয়া উচিত এবং উপরিভাগ মসৃণ। তপ্ত পদ্ধতিতে উৎপন্ন পাতে এসব গুণাবলীর অভাব ঘটে। সুতরাং, এদেরকে আবার শীতল পদ্ধতিতে পুনরাবর্তিত করে নিতে হয় যাতে নিকেল, টিন বা দস্তা লেপন করা সম্ভব হয়।

শীতল আবর্তন তিন বা চার আবর্তকে করা হয়।

তপ্ত আবর্তনশালা থেকে প্রাপ্ত পাতগুলির উপরিভাগ জারিত হয়ে শক্ত মত থাকে। এই দোষ দূর করতে পাতগুলি প্রথমে লঘু মুরিয়াটিক বা সালফিউরিক এ্যাসিডে ধুয়ে যান্ত্রিক উপায়ে সাফ করে শুকিয়ে নিতে হয়। তারপর এদের গুণাগুণ বিচার করে শতকরা 30 থেকে 50 ভাগ পাতলা করে নেওয়া হয়। ফলে পাতের গঠন শৈলী বিশেষভাবে ব্যাহত হয়ে খুব শক্ত এবং ভঙ্গুরপ্রবণ হয়। তাই এদেরকে কোমলায়িত করে ঘূর্ণন ব্রাসে পরিষ্কার করে নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। পরিশেষে গা-ঘষা গোছের আবর্তন পদ্ধতিতে কম করে শতকরা 0·5 ভাগ বা সর্বোপরি শতকরা 2 ভাগ বেধ কমিয়ে আনার পর উপরিভাগ বেশ চকচকে হয়ে উঠে।

সবশেষে পাতগুলি অনুভূমিকরণ যন্ত্রের সাহায্যে পাট পাট করে সাজিয়ে তেল লাগিয়ে অবশ্যই যান্ত্রিক উপায়ে মাপ মত কাটার পর গুদামজাত করা হয়।

চওড়া ফালি কর্মশালা

বর্দ্ধিত পাত এই কর্মশালার কাঁচামাল। এক একটি পাতের আনুমাণিক মাপ লম্বায় ছ'মিটার (6 মিঃ) এবং পুরুতে দশ থেকে কুড়ি সেণ্টিমিটার মত।

আবর্তন শুরু করার পূর্বে পাতগুলির উপরিভাগ ভাল করে পরীক্ষা করে ত্রুটিযুক্ত স্থানগুলি অগ্নি-শিখার সাহায্যে পরিষ্কার করে দিতে হয়। পরে চুল্লীতে ঢুকিয়ে এগুলিকে উত্তপ্ত করে তুলতে হয় আবর্তন তাপাঙ্ক মাত্রায়, প্রায় 1250° সেলসিয়াস। পরবর্তী পর্যায়ে এরা প্রবেশ করে দু' আবর্তক সম্পন্ন আধারে। সেখানে উপরিভাগের খোসা খানিকটা আলগা হবার পর প্রচণ্ড জলের ঝাপটায় পুরোপুরি খোসামুক্ত হয়।

খোসামুক্ত হয়ে পাতগুলি চার আবর্তক যন্ত্রে পিষ্ট হয়ে, কম বেশি 19 মিলিমিটার পর্যন্ত পাতলা হবার পর, আবার জলের ঝাপটায় খোসামুক্ত করার ব্যবস্থা। পরে যখন এরা শেষ পর্যায়ের প্রক্রিয়ার জন্য তর তর করে এগিয়ে যেতে থাকে তখন দেখতে দেখতে জ্যোছনা প্লাবিত বেগবান নালার দৃশ্য চোখে ভেসে ওঠে। সর্বশেষ আবর্তন যন্ত্রে প্রবেশ করার পূর্বেও পাতগুলির এবড়ো-খেবড়ো ভাব মিটিয়ে, জলের ঝাপটায় খোসামুক্ত করতে হয়। আবর্তন সমাপ্তি মুখে গতিবেগ গিয়ে দাঁড়ায় প্রতি সেকেণ্ডে 13 মিটারের মত। বেধ হয় 1·59 মিলিমিটার। বেরিয়ে আসার মুখে উপর নীচ দুদিক থেকেই শীতল জল ছেটাবার ব্যবস্থা। পরে যান্ত্রিক উপায়ে কুণ্ডলী পাকান হয়। প্রয়োজনে বেরিয়ে আসার মুখে কৃন্তক যন্ত্রে মাপ মত কেটে নেবার পর স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে পাতগুলি নির্দিষ্ট স্থানে সাজিয়ে রাখার ব্যবস্থা।

টিনের পাতও এথেকেই তৈরি হয় পুনরাবর্তনের মাধ্যমে।

সরু ও মাঝারি ফালি কর্মশালা

এমন অনেক শিল্প আছে যেখানে বড় মাপের ফালির চাইতে সরু বা মাঝারি রকম চওড়া ফালি বেশ আদরের। তাপ পরিচর্যাও অনেক সরল এবং অর্থ সাশ্রয়কারী। খাতিরটা সেকারণেও বটে। যেসব ভোগ্য-পণ্য এসব ফালি থেকে তৈরি হয় তার তালিকা বেশ দীর্ঘ। তার মধ্যে কয়েকটি হল ঃ কলমের নিব, বোতাম, কব্জা, তালা, ছোট বড় ঘড়ি, স্প্রিং, ঘরগুছালি বস্তু, আসবাব যন্ত্রের ক্ষুদ্রাংশ, খেলনা, বৈদ্যুতিক এবং সূক্ষ্ম ইনজিনিয়ারিং কর্মের উপযোগী দ্রব্য। জোড়া লাগান নলও এ ধরনের ফালি থেকে তৈরি করা সহজ।

সামান্য হেরফের করে আবর্তন পদ্ধতি চওড়া ফালির অনুরূপ।

সময়ের সাথে সাথে যেমন বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি ঘটে চলেছে সেই সাথে তাল রেখে বেড়ে যাচ্ছে সাধারণ মানুষের হরেক রকম ভোগ্য পণ্যের চাহিদা। সেই দ্রুত প্রসারমাণ চাহিদা মেটাতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কেবলমাত্র আবর্তনের মাধ্যমেই বিক্রয়যোগ্য ভোগ্য-পণ্য বাজারে ছাড়া সম্ভব হচ্ছে। যে যন্ত্রে এবং পদ্ধতিতে এবংবিধ কর্মসম্ভব তা সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের এবং জটিল।

নল উপাখ্যান

এই নল, দয়মন্তীর স্বামী নল নয়। এই নল হচ্ছে সেই নল যার মাধ্যমে জল, তেল, গ্যাস এবং নানা জাতীয় রাসায়নিক তরল পদার্থ একস্থান থেকে অন্য স্থানে প্রবাহিত করা হয়।

ইস্পাতের নল দু' ধরনের ঃ (1) জোড় বিহীন, (2) জোড় লাগান।

প্রথমটি তৈরি করতে একটি চতুষ্কোণ বর্দ্ধিত পিণ্ডকে এফোঁড় ওফোঁড় করে আবর্তন পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট মানে আসার পর মাপ মত কেটে ফেলা হয়। উৎপাদনের সময় নানা জটিল সমস্যা দেখা দেয় যার ফলে ইঞ্জিনিয়ার এবং প্রযুক্তিবিদরা নির্মাণ কর্মকে বিশেষভাবে মর্যাদা দিয়ে থাকে। দামও অপেক্ষাকৃত একটু বেশি হয়।

উপযুক্ত জোড়হীন নল উৎপাদনের অনেক প্রথা পদ্ধতি চালু আছে। সব বিন্যাস করতে গেলে হয়তো ধান ভানতে শিবের গীত হয়ে যাবে। তবে নামকরণের বৈচিত্রের জন্য মাত্র একটি পদ্ধতির উল্লেখ না করে পারছিনা ঃ নামটি হল পিলজার পদ্ধতি। ইংরিজী pilgrim (তীর্থযাত্রী) কথাটি জার্মাণ ভাষায় বলা হয় pilger। তীর্থে গিয়ে যাত্রীরা তীর্থস্থানের দিকে এগিয়ে যাবার সময় দুপা সামনে যায় তো এক পা পিছিয়ে আসে। নল উৎপাদনের যান্ত্রিক ব্যবস্থাটাও এমনি আগু-পিছুর। নামকরণের ব্যাপারটা সত্যিই তারিফ করার মত।

জোড় লাগান নল তৈরি করতে লম্বা ফালি বা পাত দুটোকেই কাজে লাগানো যেতে পারে। তাড়িত উপায়ে জোড়া লাগান হয়। বাজারে এর বিক্রয় মূল্য কম হলেও এই নল সব রকম কাজের উপযুক্ত নয়।

লোহা এবং ইস্পাত শিল্পে শক্তি চক্র

আমরা দেখতে পাই না সচেতন ভাবে বুঝতেও পারি না, আমাদের শরীর মধ্যে জৈবিক নিয়মে অবিরত দহন প্রক্রিয়া ঘটে চলেছে। তার জন্য যে জ্বালানির দরকার তা যোগান দেয় আমাদের খাদ্য। এই খাদ্যই হজম হয়ে দেহের বিভিন্ন অংশে অনুপ্রবেশ করে শরীরের পুষ্টি সাধন করে। এই অংশগুলিই আবার হজম যন্ত্রটিকে সতেজ রাখতে সাহায্য করে। অর্থাৎ, একে অপরের পরিপূরক। এই খাদ্য নামক জ্বালানি সংগ্রহ করতে মানুষকে খাটতে হয়।

একইভাবে বলা যায় ঃ যে পর্বত প্রমাণ জ্বালানি যেকোন সম্পূরিত (integrated) ইস্পাত কারখানায় নিত্য প্রয়োজন তার সরবরাহ অব্যাহত রাখতে কম মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয় না। খাদ্য-দ্রব্যের মধ্যে যে তাপন মূল্য (calorific value) আছে তার সাহায্যে আমরা স্থির করি আমাদের সুষম খাদ্য তালিকা।

একইভাবে লোহা এবং ইস্পাত শিল্পেও পেয়ে যাই যে তাপ ও শক্তির প্রয়োজন সেই তাপ ও শক্তি চক্রের আবর্তন এবং জ্বালানি সুষম প্রয়োগের পথ নির্দেশিকা।

মোটামুটি হিসেবে এক টন কাঁচা কয়লার তাপন মূল্য 5,49,36,000 কেজি ক্যালরি। এর প্রকৃত মূল্য আঁচ করতে হলে মনে রাখতে হবে যে এক কেজি ক্যালরির অর্থ হল সেই তাপ মাত্রা যা এক কেজি জলের তাপাঙ্ক মাত্রা 1° সেলসিয়াস বৃদ্ধি করতে পারে। কিন্তু, কাঁচা কয়লাকে যখন কোক কয়লায় রূপান্তরিত করা হয় তখন 1 টন কাঁচা কয়লা থেকে পাওয়া যায় 15 হন্দরের মত কোক। অর্থাৎ, পঁচিশ-শতাংশ কম। কিন্তু, মজা হল এই যে ওজনে কমলেও তাপন মূল্য বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় 70,56,000 কেজি ক্যালোরিতে। মানে 28 শতাংশেরও বেশি। মারুত চুল্লীতে যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় খনিজ লোহা গলান হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় তাপ ও কার্বন যোগান দেয় কোক কয়লা। এই বিক্রিয়ায় কার্বন আংশিকভাবে পুড়ে যায়। বেশির ভাগই কার্বন মনক্সাইড রূপে চুল্লী জাত গ্যাসের সাথে মিশে চুল্লীর গলা বেয়ে বাইরে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাকে পালাতে দেওয়া হয় না। কারণ, এই গ্যাসই যে সম্পূরিত কারখানায় তাপ ও শক্তির মেরুদণ্ড স্বরূপ। লোহা এবং ইস্পাত শিল্পে তাপের প্রয়োজন প্রতি পদক্ষেপে। তাপ যোগায় গ্যাস। যন্ত্র চালাতে চাই বিদ্যুৎ। সেই বিদুৎ উৎপাদন কেন্দ্রেও চাই জ্বালানি গ্যাস।

আগেই বলা হয়েছে যে মারুত চুল্লীজাত প্রাপ্ত গ্যাস থেকে আমরা উপজাত হিসেবে অনেক নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পেয়ে থাকি। উন্নত দেশে এই গ্যাস পরিশ্রুত হয়ে দূর দূরান্তে চলে যায় গৃহস্থালি এবং নানা কারখানার চাহিদা মেটাবার জন্য।

মারুত চুল্লী জাত গ্যাসের সাথে সম্পূরিত কারখানার বিভিন্ন বিভাগ এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে যেকোন একটি চুল্লী কোন কারণে বিফল হলে চারদিকে প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

ইস্পাতের বিজয় কেতন

লোহা এবং ইস্পাত জল হাওয়ার মত আমাদের অস্তিত্বের সাথে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। পুতুলের মার হাতের নোয়া, কাঁথা সেলাই করার সূঁই থেকে শুরু করে মহাকাশ পাড়ি, কোথাও ওকে ছাড়া আজ আর আমাদের নিস্তার নেই।

তবে

কথায় বলে ঝিনুক মেপে খেলেও রাজার গোলা ফুরায়। লোহা এবং ইস্পাতের ক্ষেত্রেও একথা সমভাবে প্রযোজ্য। কারণ, মাতা বসুন্ধরা তার দেহাভ্যন্তরে যত বিপুল ভাণ্ডারই জমা করে রেখে থাকুন না কেন, তাতে নতুন করে তো আর কিছু জমা পড়ছে না। তাই, আমাদের লোহা এবং ইস্পাতের উপর নির্ভরশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে ভয়ংকর সেদিনের কথা ভাবতেও আতঙ্কিত হতে হয়। কিন্তু, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিদ্যা এগিয়ে চলেছে নিত্য নতুন দিগন্তের দ্বার উন্মোচন করতে করতে। তাই, প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ডাঃ সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের কথা ঃ "এমন কোনও সীমান্ত নেই যা বিজ্ঞান অতিক্রম করতে পারবে না" ঃ স্মরণ করে নিশ্চয় আমরা আশ্বস্ত বোধ করতে পারি।

(খনিজ) লোহা থেকে ইস্পাতের কথা হলো সমাপন
ইচ্ছামত লও এবে যার যাহা মন।

পুস্তকে ব্যবহৃত পারিভাষিক তালিকা

Agglomerate—পিণ্ডীভুত করা
Allumineous—এ্যালুমিনাস খনিজ
Apron Gate—বিশেষ ধরনের দরজা
Argillaceous—আরজিল্যাসাস খনিজ
Basic—ক্ষারকীয়
Beam—কড়ি
Bearings—অক্ষনাড়ি
Belly—পেট
Belt—বলয় ঢাল
Betonite—বিটোনাইট
Billet—বিলেট
Bin—ভাঁড়ার বাক্স
Bitumineous—বিটুমিনাস খনিজ
Blast Furnace—মারুত চুল্লী
Blending—মিলমিশ
Bloom—ব্লুল/বর্ধন
Blooming Mills—বর্ধন কর্মশালা
Bosh—বশ
Bucket charging—বালতি ঢালা
Burden—ভার
Burner—দীপ
Calcareous—ক্যালকেরিয়াস খনিজ
Calcining—ভস্মীকরণ
Calorific value—তাপন মূল্য
Captive Power Plant—একান্ত নিজস্ব মালিকানায় শক্তিকেন্দ্র
Carbonate—কারবন কাল খনিজ
Combustion—দহন
Composition—সংযুতি
Compressed—সংনমিত
Cone—শঙ্কু
Converter—পরিবর্তক
Cores—মূল
Cross Section—প্রস্থচ্ছেদ
Crucible—মুচি
Cupola—কিউপলা
Cyclone—ঘূর্ণবাত
Dinz—ডিনজ
Direct Reduced Iron—সরল বিজারিত লোহা
Distributor—পরিবণ্টক
Dolomite—ডোলোমাইট
Donitz—ডোনাইজ
Double Due—দ্বি দ্বিগুণ
Down Hill—উৎরাই
Drive—নোদানা
Ductility—প্রসার্ধতা
Electric Are—তাড়িত চাপ
Electrode—তাড়িদ্বার
Excavator—খোদাই শাবল
Extrusion Process—নিঃসারী পদ্ধতি
Fettling—ফেটলিং
Flaming Torch—শিলা টর্চ

Flux—বিগালক
Forging—নিস্পেষণ
Four High Rolls—চার উচ্চতার আবর্তক
Furnace Top Bell—চুল্লী শীর্ষ ঘণ্টা
Gangue—খনিজ মল
Gypsum – জিপসাম
Hardness—খরতা
Heamatite—লাল খনিজ
Hearth—মেঝে
Heat Resitant Steel—তাপরোধী ইস্পাত
High speed—অতি দ্রুতী
High Temperature Steel—উচ্চ তাপমান ইস্পাত
High voltage—উচ্চ চাপ
Homogenising—সমীকরণ
Horizontal—অনুভূমিক
Hydraulic—ঔদক
Incipient—উপক্রান্তা
Integrated—সম্পূরিত
Killed—নিহত
Laddle- -পাত্র
L. D—এল, ডি
Limonite—বাদামী খনিজ
Linz লিনজ
Lubricant—যন্ত্রে লাগাবার তেল
Magnatite—কাল খনিজ
Magnetic—চৌম্বক
Magnetic concentration—চৌম্বক সমাহরণ
Malleable—নমনীয়
Mass—ভর
Mini – মিনি/লঘু
Mixture—মিশাল
Monkey—বাঁদর
Neck—গলা
Non coaking—অ-কোক
Open Hearth খোলা মেঝে
Oxidised—জারিত
Oxygen Lance—অক্সিজেন বর্শা
Pass—আবর্তন (কর্মশালায় প্রচলিত)
Pellet—পেলেট/গুল
Pilgrim—তীর্থযাত্রী
Pneumatic Hammer Drill—গ্যাস চালিত হাতুড়ি ছিদ্রক
Polishing wheel—পালিশ চাকা
Push Buttom—টেপা বোতাম
Quartzite—কোয়ার্জাইট
Red Hot—লোহিত তপ্ত
Red short—ভঙ্গুর
Reducing Reaction—বিজারণ বিক্রিয়া
Refractory—দুর্গল
Re-Rolling—পুনরাবর্তন
Retort—বকযন্ত্র
Roll—আবর্তক
Rolling—আবর্তন
Rolling Mills—আবর্তন কর্মশালা

Rolling Temperature– আবর্তন তাপাঙ্ক
Rotary Kiln—ঘূর্ণ ভাটি
SAIL—(সেইল) ষ্টিল অথরিটি অফ ইণ্ডিয়া লিঃ
Scale car—মাপক গাড়ি
Scrap —বর্জ্য
Seliceous Ores—সিলিসাস খনিজ
Shaft kin—খাড়া ভাটি
Shearing Machine—কৃন্তক যন্ত্র
Sintering—সিনটারিং
Skip—খাঁচা ঢালা
Skull Cracker Crane—খুলি ভাঙ্গা ক্রেন।
Slabbing Ingot—চেপটা ফলক
Slag—ধাতুমল
Soaking Pit—বিশেষ ধরনের খাদ
Specific gravity—আপেক্ষিক গুরুত্ব
Stack—মালাধার
Stand by—মুশকিল আসান
Standard Milk—বিশেষ মানের দুধ
Tap Hole gun—নলমুখ যন্ত্র
Tensile—টান
Tensile Strength—টান শক্তি
Throat—গলা
Tools—সাধনী যন্ত্র
Tool steel—সাধনী ইস্পাত
Two High Reversing Mill—উলটোমুখী দু' আবর্তক
Two/Three/Four High Rolls —দুই/তিন বা চার উচ্চতার আবর্তক
Tuyere—টুইয়ার
Universal Mill—সর্বার্থ-সাধিকা
Up Hill—চড়াই
Vacuum—নিবাত
Valve—কপাটক
Volatile—উদবায়ী

পর্ষদ প্রকাশিত বিজ্ঞান পুস্তিকামালার কয়েকটি

দশ টাকা